সুহাসিনী

নরেন্দ্র দেব

উৎসর্গ

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিলয়

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

দাদা,

কেদার-বাহিনী অনাবিল হাস্যরসের ঝর্ণাধারার মধ্যে বিক্ষুব্ধ বেদনার যে অশ্রু-পান্না বিকীর্ণ হতে দেখে মুগ্ধ হয়েছি—অনুরাগী ভক্তের এই অঞ্জলি সেই স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ধন্য হতে চাই।

প্রণত

নরেন

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রাচুর্য নেই একথা অনস্বীকার্য।

গল্পগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল—সম্পাদক বন্ধুগণের 'বিশেষ ফরমায়েসে'র তাগিদে।

রচনাগুলি তখনকার মত পাঠকদের মুখে হয়ত সাময়িক হাসি ফোটাতে পেরেছিল, কিন্তু রস-সাহিত্যে এগুলি স্থান করে নিতে পেরেছে কি না—এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট দ্বিধা থাকায় এতদিন এগুলিকে একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিনি।

সম্প্রতি 'সমঝদার বন্ধু'দের কুপ্ররোচনায় সুহাসিনীকে সকলের সামনে উপস্থিত করলুম। আশাকরি সুহাসিনী 'লোক না হাসিয়ে' লোককে হাঁসাতে পারবে।

৭২।২, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা

নরেন্দ্র দেব

সূচী

স্টেট্‌-গেস্ট্‌

সেবার পূজোর ছুটিতে সুরমা কিছুতেই ছাড়লে না। বললে—আমি এবার যাবই। মেজদিরা সাবিত্রী পুষ্কর করে এলো, অমনি উদয়পুরের 'একলিঙ্গ' আর জয়পুরে গোবিন্দজীর পূজো দিয়ে এসেছে।

তীর্থের যত রকম বিভীষিকা আছে, বাস্তব ও কল্পনার রং মিশিয়ে আমি তাকে সমস্তই বর্ণনা করলুম। কিন্তু, শোনে কে?

সুরমা বললে—ওসব তোমার বাজে কথা। তাহলে আর চাঁদু সুধার মত দুটো বাচ্ছা মেয়ে মার সঙ্গে গিয়ে কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ ঘুরে আসতে পারতো না। তুমি নিয়ে যাবেনা তাই বলো না কেন?

ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম—ওসব জায়গায় বুঝি তোমাদের চেনা পরিচিত অনেকে আছেন?

সুরমা বললে—নাও কথা! দেশ-দেশান্তর জুড়ে সৃষ্টির জায়গায় চেনা-পরিচিত লোক থাকে—এমন ত কখনো শুনিনি!

অত্যন্ত নিরীহর মত জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে বিদেশে গিয়ে মেয়েছেলেরা কোথায় উঠেছিল?

সুরমা উৎসাহিত হয়ে বললে—কেন? থাকবার ভাবনাকি সেখানে? মেজদি গল্প করলে—কত সুন্দর ধর্মশালা আছে, পাণ্ডাবাড়ী আছে—

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলুম—আরে ছোঃ! ধর্মশালায় আবার ভদ্রলোকে থাকে?

সুরমা রেগে উঠে বললে—ধর্মশালায় থাকবেনা ত কার বাড়ী গিয়ে উঠবে—শুনি?

গম্ভীরভাবে বললুম—আমি যদি তোমায় নিয়ে যাই কখনো, তুমি সর্বত্র "রাজ-অতিথি" হয়ে থাকবে। "স্টেট্‌-গেস্ট্‌"—বুঝলে?—

সুরমা আশাতীত খুশি হয়ে আমার মুখের দিকে তার হাসি-মুখখানি

তুলে বললে—ঈশ্! সত্যি বলছো? তাহলে কিন্তু বেশ হয়! মেজদিরা ধর্মশালায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে ঘুরেছে। পাণ্ডাবাড়ীর আলোচাল সিদ্ধ খেতে হয়েছে—

একটু গর্বিত হয়েই বললুম—জানোনা বুঝি? পাঁচগাঁওর রাজার দেওয়ান হচ্ছেন আমার সম্পর্কে দাদামশাই! বিজয়পুরের রাজার প্রাইভেটসেক্রেটারী ত আমার জেঠুমামা! আমরা যদি যাই, শুধু একখানা টেলিগ্রামের ওয়াস্তা। একেবারে হাতী, ঘোড়া, লোক, লস্কর, পাইক, বরকন্দাজ এসে ষ্টেশন থেকে আমাদের কী রকম খাতির করে নিয়ে যাবে দেখবে!

এরপর সুরমাকে নিরস্ত রাখা গেল না। টেলিগ্রাম আমাকে করতেই হল, এবং, ভালো একটা দিন দেখে মোটঘাট বেঁধে 'দুর্গা' বলে বেরিয়েও পড়তে হল। সঙ্গে আমার ছোট ভাই কালোকেও নিলুম। স্ত্রীজাতি নিয়ে একলা বিদেশে যাওয়া ঠিক নয়!

কালোকে সঙ্গে নিয়ে যে কতবড় ভুল করেছি সেকথা বেশ বুঝতে পারলুম যখন সুরমা গাড়ীতে উঠে আমাকে তার তীর্থ ভ্রমণের সুদীর্ঘ ফর্দটি দিলে।

বেশ উৎসাহিত হ'য়েই সুরমা বললে—ওগো শোনো, আমরা এখান থেকে বরাবর কাশী যাবো। কাশী থেকে বিন্ধ্যাচলে মা বিন্ধ্যবাসিনীকে দর্শন করে প্রয়াগ যাবো। সেখান থেকে বেরিয়ে মথুরা বৃন্দাবন দিল্লী আগ্রা হয়ে আজমীর জয়পুর অম্বর উদয়পুর ঘুরে মাউণ্ট আবু দেখে বাড়ী ফিরবো—কেমন?

আমি আর জবাব দেবো কি! অকস্মাৎ সুরমার এই অসাধারণ ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে একেবারে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিলুম। কারণ, সুরমার বিদ্যার দৌড় যে 'শিশুপাঠ' পর্যন্ত এ আমি বেশ জানি।

কোনো উত্তর না পেয়ে সুরমা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। চোখ রাঙিয়ে জানতে চাইলে—কি? জবাব দিচ্ছ না যে বড়?

এবার জবাব দিতে হল। বললুম—টিকিট কিনেছি—বিজয়পুর পর্যন্ত। রেল কোম্পানী তোমাকে অত জায়গায় যেতে দেবে কেন?

সুরমা জোর করেই বললে—নিশ্চয় দেবে। কেন দেবে না? তুমি ঠিক জানোনা। ঠাকুরপো বলেছে—প্রতি একশো মাইলে আমরা একদিন করে জিরেন্ পাবো। যেখানে খুশি নামতে পারবো। তাছাড়া কাশী বিন্ধ্যাচল দিল্লী আগ্রা ও সব ত আমাদের পথেই পড়বে।

আর শোনবার দরকার হ'ল না। বুঝতে পারলুম আমার মায়ের পেটের সহোদর ভাইই আমার সর্বনাশ করেছেন। লোকে যে বলে—ভায়ের তুল্য শত্রু নেই—কথাটা দেখছি ঠিক। ভেবেছিলুম কেবল বিজয়পুরে গিয়ে 'স্টেট-গেস্ট্' হয়ে দিনকতক থেকে আসা যাবে, অল্প খরচায় লম্বা ট্যুর হবে একটা। কিন্তু সে আশা ত্যাগ করতে হ'ল। কালো যে এমন করে আমায় ডোবাবে এ আমি ভাবিনি। তবু জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ডও চেপে ধরে, তেমনিই মরিয়া হয়ে বললুম—কিন্তু, 'রিটার্ণ টিকিট' যে! অত ঘুরতে গেলেত' সময়ে ফিরতে পারবো না। টিকিট পচে যাবে—

সুরমা তার বড় বড় দু'চোখ কপালে তুলে বললে—সে কি গো? ঠাকুরপো যে বললে—এ টিকিটে পুরো দেড়টি মাস আমরা ঘুরতে পারবো। এর নাকি পঁয়তাল্লিশ দিনের মেয়াদ আছে?—

কালোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখি ভায়া বেঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্তে সরে গিয়ে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাল মানুষটি সেজে বসে আছে। মনে হল যেন মৃদু মৃদু হাসচে। চীৎকার করে বললুম—**What a mischievous boy you are!**

সুরমা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো। আহা, ছেলে মানুষ, হয়ত পড়তে

ভুল ক'রেছে। তুমি ওকে বকছো কেন? নিজে একবার টিকিটগুলো পড়ে দেখোনা বাপু।—

সুরমা টিকিটগুলি বার করে আমার হাতে দিলে। আমার কাছে টিকিট রাখাটা সে নিরাপদ মনে করেনি। সেই যে একবার চীনে-বাজার থেকে একটা ছাতা কিনে ট্রাম বন্ধ দেখে ট্যাক্সী ভাড়া করে বাড়ী এসেছিলুম এবং মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠে আসতে, সুরমা যখন দেখতে চাইলে কি রকম ছাতা কিনেছি, তখন জানা গেল যে, ছাতাটা গাড়ীতেই পড়ে আছে—নামানো হয় নি! তখনি নেমে গিয়ে ছুটে রাস্তার মোড় পর্যন্ত দৌড়-ঝাঁপ করে আসা গেল বটে, কিন্তু ট্যাক্সি তখন উধাও! সেই থেকে সুরমার আমার উপর নির্ভরতা কমে গেছে।

কালোর কাছেও সুরমা কিছু রাখতে ভরসা পায়না। কারণ, কালো নাকি ছেলেমানুষ। অবশ্য সুরমার কাছে কালো আজও ছেলে মানুষই বটে, কিন্তু, বাংলাদেশের পাত্রীর পিতারা কেউই তাকে ছেলেমানুষ মনে কর্‌ছেন না। এ বছর সে এম্‌-এস্‌-সি পাশ করবার পঁর থেকেই তাঁরা ঘটক ঘটকি পাঠাতে শুরু করেছেন!

সুরমা যখন প্রথম আমাদের বাড়ী বধূবেশে এসেছিল কালো তখন মাত্র দশ বছরের ছেলে, স্কুলে ক্লাশ ফাইভে পড়ে। সুরমার কাছে সে আজও সেই ক্লাশ ফাইভেই আছে। এক ক্লাশও প্রমোশন পায় নি।

সুরমা জেদী মেয়ে। কোথাও যাওয়া সে বাদ দিলে না। কাশী বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন দিল্লী আগ্রা সমস্ত ঘুরে রাজপুতনায় যাবার সময় ঠিক হল আমরা আগে উদয়পুর হয়ে তারপর বিজয়পুরে যাবো। কারণ, এত ঘুরাঘুরির ফলে সকলেরই একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। বিজয়পুরে গিয়ে 'স্টেট্‌-গেস্ট্‌' হয়ে দিনকতক আরামে থাকা যাবে—এ ইচ্ছা সকলেরই দেখা গেল।

গাড়ীতে উঠে সুরমা বললে—আগে যে উদয়পুর যাবো বলছো,—তা হলে বিজয়পুরে টেলিগ্রাম করলে কেন যে অমুক দিন পৌঁছচ্চি? তারা নিশ্চয় লোকজন গাড়ী ঘোড়া নিয়ে স্টেশনে এসে অনর্থক হায়রাণ হ'য়ে ফিরে যাবে—

বুঝতে পারলুম—ব্যাপারটা ভাল করি নি। কিন্তু সে কথা ত' আর স্ত্রীর কাছে স্বীকার করা চলে না। বললুম—অনর্থক ফিরে যাবে কেন? কালোকে দিয়ে আমি স্টাইলের উপর তাদের হাতে একখানা চিঠি দেবো যে—উদয়পুরের মহারাণার বিশেষ অনুরোধে আমরা আগেই উদয়পুর যেতে বাধ্য হলাম। কবে যে বিজয়পুর আসতে পারবো তা এখন ঠিক বলতে পারছিনি! যখন আসতে পারবো তখন আবার টেলিগ্রাম করে জানাবো।

সুরমা রেগে লাল! বলে—মিছে কথা লিখবে কেন? ওঁরা যদি জানতে পারেন লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না!

গম্ভীরভাবে বললুম—রাজারাজড়ার ব্যাপারে তুমি কথা কইতে এসো না। তুমি এর কি বোঝো? এই স্টাইলেই দেখবে বিজয়পুর মাৎ হয়ে যাবে। যখন আসবো ডবল খাতির করবে।

সুরমা বিরক্তভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে একটু সরে বসে ব'ললে—ছাই করবে।

পরের দিন সকালে গাড়ী যখন বিজয়পুর স্টেশনে এসে পৌঁছলো দেখি মেলাই লোকজন নিয়ে বিজয়পুরের একজন হোমরা চোমরা অফিসার ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্টগুলোর কাছে গিয়ে আমায় খুঁজচে।

ভাগ্যিস্ বুদ্ধি ক'রে আমি আগের স্টেশনে একখানা খালি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় কালোকে চিঠি হাতে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলুম। জানি, রাজ-অতিথিদের ওরা ফার্স্ট ক্লাশেই খুঁজবে! এ দিকে আমি চলেছি তখন সপরিবারে ইণ্টার ক্লাশে! আমায় চেনেনা কেউ এরা—এই রক্ষে।

কালো ফার্ষ্টক্লাশের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার চিঠিখানা খুব গম্ভীরভাবে বিজয়পুরের অফিসারের হাতে দিলে। তার রকম দেখে খুশি হলুম। হ্যাঁ, ভায়াকে আমার লেখাপড়া শেখানো সার্থক হয়েছে বটে।

অফিসার চিঠি খুলে পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই হুইস্‌ল্‌ দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

*   *   *

উদয়পুর ঘুরে একলিঙ্গ দর্শন করে আমরা যেদিন ফিরবো, সেই দিনই বিজয়পুরে আবার এক এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম ক'রে দিলুম—অমুক সময় অমুক ট্রেণে আমরা যাচ্ছি।

এবার আমাদের সকলকেই উদয়পুর থেকে বিজয়পুর পর্যন্ত ফার্ষ্টক্লাশ টিকিট কেটেই আসতে হ'লো। কারণ, রাজপ্রতিনিধিরা স্টেশনে এসে যে গাড়ী থেকে আমাদের নামাবেন! গেলবারে দেখে গেছি ফার্ষ্টক্লাশে এসেই তাঁরা আমাদের খোঁজেন। এবারও নিশ্চয় তাই খুঁজবেন।

স্থরমা এতে আপত্তি করে নি। তবে এই টুকু শুধু জানিয়ে দিয়েছিল যে, 'রেস্ত' ফুরিয়ে এসেছে। হাতে আর টাকা নেই, ফার্ষ্ট ক্লাশে গেলে বিজয়পুর থেকে আর কোথাও যাওয়া চলবে না। সটান বাড়ী ফিরতে হবে।

আমরা দুই ভাইই জোর ক'রে বলেছিলুম—তা না হয় বিজয়পুর থেকেই বাড়ী ফেরা যাবে। সেখানে তো আর একপয়সাও খরচ লাগবে না। 'স্টেট্-গেস্ট্' হয়ে থাকতে হলে ফার্ষ্টক্লাশে যেতেই হবে!

স্থরমা আর কথা বলেনি। গাড়ী বিজয়পুর ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতে আমরা ফার্ষ্টক্লাশের জানালা থেকে যথাসম্ভব মুখ বাড়িয়ে সেই অফিসার ও তার লোকজনকে খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু, কাউকেই দেখতে পেলুম না। আমাদের মুখ শুকিয়ে এলো। বৃথাই ফার্ষ্টক্লাসে আসা!

সুরমা বললে—বেশ হয়েছে। যাও, আগে উদয়পুরের মহারাণার বিশেষ অনুরোধ রাখতে যাও। এখন কি করবে?

আমি একটা ঢোঁক গিলে—একটু আমতা আমতা ক'রে বললুম—নিশ্চয় এরা আমাদের টেলিগ্রাম পায় নি! এই জন্যেইত কালোকে বার-বার বলেছিলুম—তুই নিজে গিয়ে পোষ্টঅফিস থেকে টেলিগ্রামটা ক'রে আয়। কথা শুনলে না। ধর্মশালার পাণ্ডাকে দিয়ে পাঠালে। সে বেটা নিশ্চয় টাকাটা ট্যাকস্থ করেছে। টেলিগ্রাম পাঠায়নি!—

কালো বললে—তা' কি ক'রে হবে? সে যে রসিদ এনে দিয়েছে। এই দেখুন না! তাড়াতাড়ি তার ব্যাগের ভিতর থেকে রসিদ খানা বার ক'রে আমায় দেখালে।

রসিদখানা পরীক্ষা ক'রে দেখছি, এমন সময় সুরমা চেঁচিয়ে উঠলো—ওগো, গাড়ী নড়ে যে! ছেড়ে দিলে বোধ হয়! চলো দুর্গা বলে নেমে পড়ি এইখানেই। নইলে আগাগোড়া যে ফাষ্টক্লাশের ভাড়া ধরে নেবে!

কথাটা যুক্তিপূর্ণ! আর দ্বিরুক্তি না করে বাক্স বিছানা যখন টেনে নামাবার যোগাড় করছি, কালো বললে—দাদা, কে যেন আপনাকে খুঁজছে!—

দেখি এক খানা টেলিগ্রাম হাতে করে একটি চোগাচাপকান পরা চোপদার দ্বারবান গোছের আধাবুড়ো লোক গাড়ীতে আমার নাম ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ধড়ে যেন প্রাণ এলো! এগিয়ে গিয়ে ইংরিজিতে হিন্দীতে মিশিয়ে তাকে বললুম—তুমি যাকে খুঁজচো আমিই সেই লোক। বলতে ভুলে গেছি—'স্টেট্ গেস্ট' হতে হবে বলে আমরা দু'ভাই-ই ইংরিজি সুট পরে ফাষ্টক্লাশে উঠেছিলুম।

পরিষ্কার চোস্ত ইংরিজিতে সেই দ্বারবান গোছের লোকটি আমাকে

সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—আমি মহারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। বিজয়পুরের সৌভাগ্য যে আপনাদের এখানে পদধূলি পড়লো, ইত্যাদি—

সুরমা তখন গাড়ী ছেড়ে দেবার ভয়ে অস্থির হয়ে জিনিসপত্রগুলো নামাবার জন্য কালোকে তাড়া দিতেই, সে বেচারা ছুটে গিয়ে মোটঘাট নামাতে উদ্যত হ'ল। দ্বারবানটি তাকে নিষেধ ক'রে সবিনয়ে জানালে—আপনারা দয়া করে নেমে আসুন, জিনিসপত্র সমস্তই আমি নামিয়ে নিয়ে যাবো। ওজন্য ব্যস্ত হবেন না।

কালো বললে—কিন্তু, গাড়ী ছাড়বার যে সময় হয়েছে—

দ্বারবানটি ঈষৎ হেসে বললে—মহারাজার মাননীয় অতিথিদের-জন্য ওকে অপেক্ষা করতেই হবে।

আমি দ্বারবানটিকে জেনুমামার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলুম। সে বললে—সর্দার সেন আজ দুদিন হল মহারাজার সঙ্গে শিকারে গেছেন। আপনাদের ভার তিনি আমার উপর দিয়ে গেছেন। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু!

এই দ্বারবানটা জেনুমামার বন্ধু! মেড়োর দেশে দেখছি সবই সম্ভব! লোকটা কিন্তু ইংরিজি শিখেছে বেশ! জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি বিজয়পুরে কি কাজ কর?

দ্বারবান তার চাপকানের পকেট থেকে একখানা 'কার্ড' বার করে আমার হাতে দিলে। পড়ে দেখি—

'প্রাইমমিনিস্টার টু হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা অফ বিজয়পুর।'

একেবারে চক্ষুস্থির আর কি?—

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে ক্ষমা চাইলুম!

* * *

চারখানা বড় বড় হাতীর মত মোটর গাড়ী মহারাজা অফ

বিজয়পুরের ধ্বজপতাকা অংকিত বুকে অপেক্ষা করছিল।

প্রাইমমিনিস্টার আমাদের সেই গাড়ীতে তুলে নিয়ে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন প্রকাণ্ড এক প্রাসাদের মধ্যে! প্রাসাদাধ্যক্ষ একজন ইংরেজ কর্মচারী। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

—কাল সকালে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবো। আপনারা আজ বিশ্রাম করুন—বলে প্রাইমমিনিস্টার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখলুম বাড়ীর কার্ণিশের উপর বড় বড় পিতলের হরফে লেখা রয়েছে—'দি রিগ্যাল হোটেল—বিজয়পুর স্টেট।'

সাহেব খুব খাতির করে আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন এবং বিজয়-পুরী পাথর বসানো দক্ষিণের সুবৃহৎ এক বারান্দার কোলে সারি সারি কতকগুলি প্রকাণ্ড ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—আমার হোটেলের সবচেয়ে ভাল অংশ আপনাদের জন্য রিজার্ভ্ রেখেছি। ভারতের সমস্ত রাজা মহারাজা নবাব বাদশা বিজয়পুরে এলে আমার এইখানেই এসে ওঠেন। আমার হোটেলের অজস্র প্রশংসা করে গেছেন লক্ষপতি সব আমেরিকান ট্যুরিস্ট এসে। আশা করি, আপনারাও খুশি হবেন।

সাহেব ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হোটেলে ঢুকে দেখি হোটেলের ধোপদোরস্ত উর্দিপরা সব চাপরাশি, আর্দালি, বেহারা খানসামা আমাদের বিছানাপত্র খুলে হোটেলের স্প্রীংয়ের খাটের উপর বিছিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ঠুকলে! একজন এগিয়ে এসে আমাদের স্যুটকেস্ ও সুরমার স্টীল-ট্রাংকের চাবি চাইলে! ড্রেসিং রুমে আমাদের কাপড় চোপড়গুলো তারা সাজিয়ে রাখতে চায়!

সুরমা বললে, পাগল হয়েছো! ঐ সব ডাকাতের হাতে চাবীর গোছা তুলে দেবো আমি? তারপর এই বিদেশে বিভুঁয়ে মরি আর

কি আতাস্তরী হয়ে!

খানসামার রেজিমেণ্টের সামনে পাছে অপ্রস্তুত হ'তে হয় এই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম—পিছে হোগা! আভি যাও!

জনকতক সেলাম ঠুকে চলে গেল। জনকতক কিন্তু রয়ে গেল! তাদের মধ্যে একজন জানতে চাইলে—গোসলখানায় গরম পানি লাগবে কি না?—

সুরমা বললে—গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—এর উপর আবার গরম পানি! মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পারলে বাঁচি!—

অগত্যা তাদের আমি বলে দিলুম—গরম পানির কোন আবশ্যক নেই!

আর একজন জানতে চাইলে—ছোটাহাজারি এখনি চাই কি না!—

আমি কিছু বলবার আগেই কালো হুকুম দিলে—জলদি লে আও!

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর!' বলে তারা বেবিয়ে গেল! সুরমা এঘব ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করলে—আমবাও সঙ্গে সঙ্গে চললুম।

বেড রুম, ড্রয়িং রুম, ড্রেসিং রুম, ডাইনিং রুম, স্মোকিং রুম, বিলিয়ার্ড রুম, রিটায়ারিং রুম, রিসেপশান রুম, ড্যান্সিং হল, পোর্টিকো, ব্যালকনি, শ্যানিটারীবাথ—সমস্তই একেবারে প্রয়োজনীয় আসবাবে সুসজ্জিত এবং ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে! দেখে মনে হল—যেন আমরা বিলেতের 'সেণ্টজেমস্‌প্যালেস্' বা 'ব্যালমোবাল ক্যাস্‌লে' ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠলো। সবাই মিলে ঠিক করলুম এখন কিছুদিন আর এখান থেকে নডছিনি! দিব্যি আরামে থাকা যাবে! রাজার 'স্টেট-গেস্ট' যখন—ভাবনা কি আব!

একজন কর্মচারী এই সময় একখানা খাতা এনে আমাদের সামনে খুলে ধরে সই করে দিতে বললে। খাতাখানা নিয়ে কোথায় সই করতে

হবে দেখতে গিয়ে একেবারে চক্ষু স্থির! মুখ আমার শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল!

"রিগ্যাল হোটেল, বিজয়পুর স্টেট, ফার্ষ্ট ক্লাশ এপার্টমেণ্টস্, মাসিক চার্জ্জ—আড়াই হাজার টাকা। পনেরো দিনের জন্য—দেড় হাজার। এক সপ্তাহ—হাজার! চব্বিশ ঘণ্টায়—একশ টাকা!"

"ভোজন ব্যয়—প্রথম শ্রেণী প্রত্যেকের প্রতিদিন মাথাপিছু পনেরো টাকা মাত্র। সিগারেট ও ওয়াইন পৃথক দেয়।"

মাথা আমার তখন ঘুরতে শুরু করেছে! খাতাখানা কালোর হাতে দিয়ে বললুম—যা পার কর তোমরা। আমি কিছু জানি না।

সুরমা ও কালোরও তখন অবস্থা বুঝতে আর বাকী ছিল না। দুজনে তারা ফিস্ ফিস্ করে কি পরামর্শ করলে। তারপর, কালো খাতায় সই করে লোকটাকে ছেড়ে দিলে!

সুরমা যেই বলতে শুরু ক'রছে—কি ঝকমারি করেই তোমার কথা শুনে 'স্টেট-গেস্ট' হতে এসেছিলুম বাবা! ফতুর হতে হল দেখছি—

ঢং ঢং ঢং ঢং করে খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। উর্দিপরা খিৎমদগার এসে সেলাম ঠুকে জানালে—ছোটাহাজারি রেডি সাব।

খেতে বসে আমার গলা দিয়ে চা-বিস্কুট নামে না! ডিম আর টোস্ট যেমন তেমনি পড়েই রইল! সুরমা দেখে অভয় দিয়ে ব'ললে—খাও ভয় নেই! আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা থাকবো লিখিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার হাতে যে টাকা দিয়েছিলে তা' ছাড়া, আমি লুকিয়ে আরও একশ' টাকা এনেছিলুম, সেটা খরচ করিনি; আছে। তাইতে হোটেলে থাকার খরচ হয়ে যাবে। খাবার বলেছি শুধু একজনের দিতে! 'মেনু' যা শুনলুম তাইতেই তোমাদের দু'জনের পেট ভরে খাওয়া হ'য়ে যাবে।

শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—আর তোমার?

সুরমা মৃদু হেসে বললে—'স্টেট-গেস্ট' হয়েছি' বলে কি আমায় ঐ ম্লেচ্ছ খানাগুলো খেতে হবে? আমি 'গোবিন্দজীর' প্রসাদ আনাবার ব্যবস্থা করেছি। অবশ্য ঠাকুরপো তা থেকে কিছু ভাগ বসাবে বলেছে—

আমাদের 'ছোট হাজারি' শেষ হ'তে না হ'তেই খবর এলো—শহর দেখাবার জন্য মহারাজার মোটর গাড়ী ও গাইড্ অপেক্ষা করছে।

তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়া গেল।

ম্যানেজার জানতে চাইলে 'ল্যঞ্চ' আমরা হোটেলে ফিরে এস খাবো, না বাইরে খাবো? সুরমা ইসারা ক'রে বললে—বলো বাইরে খাবো। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা ক'রলে—আমরা ফিরবো কখন? আফটারনুন টী চারটেয় দেওয়া হয়। কালো জিজ্ঞাসা করলে তোমাদের এখানে 'ডিনার টাইম' কটায়? সাহেব বল্লে—'এইট থার্টি'।

—অলরাইট, আমরা ঠিক ডিনার টাইমে ফিরে আসবো। এই ব'লে বেরিয়ে পড়া গেল।

শহরের অনেক কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে শুনে বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ আমরা বাজারে এসে ঢুকলুম। মহারাজার প্রকাণ্ড 'রোলস রইস' বাজারের গলিতে ঢোকে না। আমরা বাঁচলুম। তাকে বড় রাস্তায় রেখে আমরা গলির ভিতর পদব্রজে প্রবেশ করলুম। একটা আরদালী গাড়ী থেকে নেমে পিছু পিছু আসছিল। কালো তাকে এক ধমক দিয়ে বললে—যাও, গাড়ীমে হাজির রহো। বেচারী চলে গেলো।

বাজারে একটি ভালো দোকান দেখে আগে গরম পুরি, শাক, আলুর দম, মুগের লাড্ডু প্রভৃতি পেট ভরে খেয়ে এক এক লোটা জল পান ক'রে মুখ মুছে ভাল মানুষের মত গাড়ীতে ফিরে আসা হ'ল। তিন জনের পেট ভরে দোকানে খেতে খরচ হ'ল মোটে সাড়ে ছ' আনা! ছ' আনাতেই হ'ত, কিন্তু, ওদের খাট্টা মিঠে আচারটা সুরমার বড্ড

ভালো লাগায় শেষকালে আরও দু'পয়সার আচার নেওয়া হ'ল। সুরমার বরাতে তৈরি পানও পাওয়া গেল পথে।

বিজয়পুরের পুরাণো কেল্লা দেখে আমরা যখন ফিরছি তখন সন্ধ্যে হয় হয়। ভায়া দেখলুম তার বৌদির কাছে থিয়েটারী ঢঙে ব'লছে—দেখে নাও বৌদি! এই বেলা যা কিছু দেখবার-আছে। ভাগ্যে মহারাজের গাড়ী খানায় ট্যাক্সী মিটার বসানো নেই! নইলে মারা পড়তুম আর কি। আর কোথাও কখন আমরা 'স্টেট্ গেস্ট্' হ'তে যাবো না বৌদি। কি বলো?—কাল ভোরে উঠেই পলায়ন। এক কাপ চা কিন্তু খেয়ে নেবো বৌদি:—

সুরমা বললে—না, হোটেলের চা খেতে হবে না—হয়ত' আড়াই টাকা এক কাপ চায়ের দাম নেবে। আমি স্টোভ্ জেলে ঘরের ভিতর তৈরী করে দেবো। তোমরা দু'ভাই চুপি চুপি খেয়ে নিও—"

কালো তাইতেই রাজী হ'য়ে ওড়াতে লাগলো—

„—একরাত্রি শুধু পরমায়ু!
তারি মাঝে শুনে নিতে হবে—
ভ্রমর গুঞ্জন গীতি—
বনান্তের আনন্দ মর্মর!—

ডিনার টাইমের একটু আগেই আমরা হোটেলে ফিরে এলুম। কাপড়চোপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে একটা বেড-রুমের মধ্যেই তিনজনে বসে গল্প শুরু করা গেল। কে আর যায় ড্রয়িং রুমে?

ঠিক সাড়ে আটটায় ডিনারের ঘণ্টা পড়ল। আমি কালোকে বললুম চলো খেয়ে আসি—! সুরমা বললে—কোথাও যেতে হবে না—লোক এসেছিল, আমি তাকে বলে দিয়েছি, বড়সাহেবের অসুখ, আমার অসুখ—আমরা কেউ খাবো না—কেবল ছোট সাহেবের খানা তোমরা তাঁর বেডরুমেই দিয়ে যাবে। তাঁর পা' জখম হয়েছে। তিনি খানা-

কামরায় যানে নেই শেকেগা !

আমি ত স্বরমার কাণ্ড শুনে হেসে বাঁচি না।

বিজয়পুরের রিগ্যাল হোটেল একজনের মতো ডিনার যা পাঠিয়েছিল, আমরা তিনজনে তা খেয়ে শেষ করতে পারলুম না। পুডিং খানিকটা স্বরমা তুলে রেখে দিলে, কাল সকালে চায়ের সঙ্গে হবে বলে।

রাত্রে শোবার সময় একটা হট্টগোল হবার যোগাড় হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টায় রিগ্যাল হোটেল সিঙ্গল বেড-রুমের জন্য চার্জ করে—একশ টাকা। কাজেই সেই ঘর বেছে নিয়ে আমরা থাকলুম যে ঘরে এক-খানির বেশী খাট নেই। স্বরমা বলে—তোমরা দু'ভাই খাটে শোও, আমি মেঝেয় বিছানা পাড়ি। কালো বললে—সে কিছুতেই হবে না বৌদি—তোমরা খাটে শোও, আমি মেঝেয় থাকবো।

অনেক বাক-বিতণ্ডার পর স্থির হ'ল যে, তিনজনেই মেঝেয় তিনটি বিছানা পেতে শোওয়া হবে।

ভোর বেলা স্বরমার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বললে—মুখ ধুয়ে এসো, চা তৈরি।

চোখ মেলে দেখি সমস্ত জিনিস-পত্র বাক্স-বিছানা গুছিয়ে বেঁধে ছেঁদে ওরা দুজনে প্রস্তুত করে রেখেছে, কেবল আমার বেডিংটাই বাকি।

লজ্জিত হ'য়ে উঠে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে চলে গেলুম।

ফিরে এসে দেখি আমার বিছানাও বাঁধা হয়ে গেছে ! কেবল চা খাওয়া বাকী !—

স্বরমা আমার কাপড় চোপড় গুছিয়ে দিতে দিতে বললে—চা'টা খেয়ে নাও, জুড়িয়ে যাচ্ছে। স্টেশনে যাবার গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। ট্রেণেরও সময় হ'য়ে এলো। চা খেয়ে পোষাক বদলে নাও।

কালো তখন কুলি ডেকে মালপত্র গাড়ীতে তুলতে শুরু করে দিয়েছে।

চায়ের কাপ নিঃশেষ হ'তেই সুরমা আমার হাতে নগদ ১২৫৲ টাকা দিয়ে বললে,—যাবার আগে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে আমাদের দেনা পাওনা মিটিয়ে ফেল। আমরা ল্যঞ্চ খাইনি, আফটারনুন টিও নিইনি। যদি পারো চেষ্টা কোরো—খাইখরচটা দশ টাকায় মেটাতে; কারণ, ঐ সম্বল, আর কিছু নেই! পাঁচটা টাকা বাঁচাতে পারলেও যথেষ্ট উপকার হবে! লোকজনগুলোর হাতে অন্ততঃ একটা ক'রে টাকাও তো দিয়ে যেতে হবে—নইলে 'স্টেট্-গেস্টের' মান থাকবে কেন?

আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে বললুম—সু'! আমাকে মাপ করো। 'স্টেট্-গেস্ট' হ'য়ে আমি পাঁচটা টাকার জন্যে ইংরেজ ম্যানেজারের কাছে কৃপা ভিক্ষা করতে পারবো না। দোহাই! তুমি কালোকে পাঠাও!

সুরমা কি ভেবে বললে—তবে থাক, সব টাকাই চুকিয়ে দিয়ে এসো। আর, লোকজনের বক্‌শিস্ বলে আরও পাঁচটা টাকা সাহেবের হাতে দিয়ে এসো। আমাদের আর বেশী কিছু দরকার হবে না; একেবারে হাওড়ায় গিয়ে ত নামবো। সেখান থেকে ট্যাক্সী নিয়ে বাড়ী চলে যাবো। বাড়ী পৌঁছে গাড়ী ভাড়া আমি দিতে পারবো। পথে শুধু কুলি আর পান সিগারেট চা জলখাবার ইত্যাদি যা খুচরো খরচ হবে তা আমার হাতে আছে!

—তবে আর ভাবনা কি?—বলে বীরদর্পে আমি অগ্রসর হলুম। ওরা আমার পিছু পিছু নেমে এসে গাড়ীতে উঠে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ম্যানেজার আমাকে দেখতে পেয়েই বেরিয়ে এসে 'গুড মর্ণিং রাজা বাহাদুর' বলে খুব সাদর হৃদ্যতার সঙ্গে আমার করমর্দন করলে এবং আমরা আজ এত সকাল সকাল উঠে বিজয়পুরের কোন্ অঞ্চল পরিদর্শন করতে যাচ্ছি জানতে চাইলে।

আমি একটু ম্লান হেসে সাহেবকে জানালুম যে—আমরা আজই এখনি বিজয়পুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সাহেব শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন? এরকম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিজয়পুর ছেড়ে যাওয়ার কারণ কি? বিজয়পুর কি আপনাদের ভালো লাগলো না?

সাহেবকে বুঝিয়ে বললুম—বিজয়পুর খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু আমার ও আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ হ'য়ে পড়াতে আমরা পালাচ্ছি।

সাহেব বললে—অন্ততঃ এক সপ্তাহ থেকে যাও রাজা সাহেব, তোমাদের শরীর খুব ভালো হ'য়ে উঠবে। বিজয়পুর Splendid জায়গা!

এমন সময় কালো গাড়ীর ভিতর থেকে তাড়া দিলে—দাদা! ট্রেণের আর টাইম নেই!...

আমিও তাড়াতাড়ি সাহেবকে বললুম—অত্যন্ত দুঃখিত, তোমার কথা রাখতে পারবো না; তোমার হোটেলের—

সাহেব আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—হোটেলে কি আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

আমি বললুম—**Far from it**! আমরা এখানে কোনও অসুবিধা ভোগ করিনি, খুব আরামেই ছিলুম। কিন্তু, যেতেই হ'চ্ছে আমাদের—অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই—

সাহেব বলতে লাগলেন—**I am very sorry—very sorry**! কিন্তু প্রাইমমিনিস্টারের সঙ্গে তো আপনাদের দেখা হ'ল না! তিনি আটটার সময় আসবেন বলে পাঠিয়েছেন—

কালো আবার হাঁকলে—দাদা, আর টাইম নেই!—

যাই!—বলে তাকে সাড়া দিয়ে আমি হাত বাড়িয়ে সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে বললুম—গুডবাই! প্রাইমমিনিস্টারকে আমি চিঠি লিখে পাঠিয়েছি, **excuse me**, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। তোমার বিলটা মিটিয়ে নাও! **Here is money for you**!

একশ পঁচিশ টাকাই বার করে সাহেবের হাতে দিতে গেলুম। সাহেব তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো—What! আপনি কি আমাকে বিজয়পুর থেকে তাড়াতে চান?

ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো! ভাবলুম—সর্বনাশ! এ ব্যাটা আরও কিছু বেশী চাইলেই ত গেছি!—আমতা আমতা ক'রে বললুম—কিন্তু, এই তো তোমার হোটেলের ইউজ্যুয়াল চার্জ্। আমি কাল তোমার খাতায় দেখেছি—

সাহেব ব্যস্ত হ'য়ে বললে—হাঁ হাঁ সে ঠিক, সেজন্য কিছু না; কিন্তু, আপনাদের কাছে ত আমি একটি পয়সাও নিতে পারব না। আপনারা যে এখানে 'স্টেট-গেস্ট' হয়ে ছিলেন। আমার উপর প্রাইম মিনিষ্টারের স্পেশ্যাল অর্ডার ছিল যে, আপনারা যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকবেন এবং যথা অভিরুচি খাবেন দাবেন বেড়াবেন—হোটেলের ও মহলটা আর কাউকেই ভাড়া দিতে পারবো ন—আপনাদের সমস্ত খরচই বিজয়পুর স্টেট বহন করবে! 'স্টেট-গেস্ট্'দের কাছে কোনো কারণেই আমাদের একটি পয়সাও নেবার হুকুম নেই! আমায় মাপ করবেন।—

মাতালের মত টলতে টলতে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠে সুরমার হাতে ১২৫৲ টাকা ফেরৎ দিয়ে যখন সমস্ত ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বললুম—চাপা গলার 'হায় হায়' শব্দে মর্মভেদী হাহাকার পড়ে গেল গাড়ীর মধ্যে।

কায়মনোবাক্যে তখন সকলে মিলে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করতে লাগলুম—হে ভগবান, যেন আজ আমরা সত্যিই ট্রেণ ফেল করি!...নইলে আর কোন মুখ নিয়ে—কি ছলে হোটেলে ফিরতে পারি?

নবাগতের বিড়ম্বনা

এক

"ওগো! যা ভয় করেছিলুম তাই! নটবর বেটা একেবারে ডুবিয়েছে!" বলতে বলতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে চাটুয্যে মশাই রুগ্না স্ত্রীর বিছানার পশে উপস্থিত হলেন। হাতে অসংখ্য ছাপমারা একখানি পোস্টকার্ড!

চাটুয্যে মশায়ের স্ত্রী উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কি? ব্রাহ্মণ সেই পোস্টকার্ড খানি পত্নীকে পড়ে শোনালেন—মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু—প্রণাম শতকোটি নিবেদন মিদং—

পরে, মাননীয় চাটুয্যে মহাশয়ের শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণামান্তে সেবক শ্রীনটবর দাসের সবিনয় নিবেদন এই যে—মহাশয়, আমি আপনার আশীর্বাদে নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি এবং আপনার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ শারীরিক কুশলে আছি। কিন্তু, অধীনের মানসিক অবস্থা উপস্থিত-ক্ষেত্রে অতিশয় শোচনীয় জানিবেন। যে হেতু গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ দৈব-দুর্বিপাকে পড়িয়া ঘটনাচক্রে আপনার সেবক আজ একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এমন কি, লিখিতে লজ্জাবোধ করিতেছি যে, দেশে ফিরিবার রেলের টিকিটখানি পর্যন্ত খোয়া গিয়াছে! এবম্বিধ নিরুপায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া এ অধম দাসানুদাস অত্র পত্রে মহাশয়ের গোচর করিতেছে যে পত্র পাঠ অবিলম্বে মনিঅর্ডারযোগে এ অধীনের নামে নিম্ন ঠিকানায় আরও পনেরোটি টাকা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এক্ষণে অর্ধপয়সার মুড়ি-বাতাসা কিনিয়া জলযোগ করিবার পর্যন্ত

আমার সঙ্গতি নাই। সুতরাং ঠাকুরাণীর ঔষধ লইয়া যথাকালে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আপনি দরিদ্র প্রতিপালক, আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করিবেন। বাটি ফিরিয়া সবিশেষ সমাচার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিব। ইতি তাং ১৫ই ভাদ্র, সাং টালিগঞ্জ থানা, সহর কলিকাতা। লিখিতং পত্রং-ইদং—

সেবক—শ্রীনটবর দাস পরামাণিক

চাটুয্যে-পত্নী কপালে করাঘাত করে বললেন—এ সমস্তই আমার পোড়াকপালের দোষ! নইলে এতলোক গাঁয়ে থাকতে তুমি ঐ অলপ্পেয়ে নটবরকে বেছে নিয়ে এতগুলো টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে কলকাতায় ওষুধ আনতে পাঠাবে কেন? আমার ত মরণ হয় না!

চাটুয্যে মশাই অপরাধীর মত মাথায় হাত বুলিয়ে আমতা আমতা করে বললেন—"ব্যাটা যে ব'ললে কলকাতা শহর ওর কাছে নতুন নয়! জমিদারবাবুর বড়ছেলের বিয়ে দি॰ ও কলকাতায় গেছলো!"

চাটুয্যে গৃহিণী একটা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—

"তবে আর কি! আমার মাথা কিনেছিল! আমিও যেমন হ'য়েছি যমের অরুচি!"

...দীর্ঘকাল রোগে ভুগে পত্নীর মেজাজ ইদানীং বেশ একটু খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা-আর নিরাপদ নয় বুঝে চাটুয্যে মশাই "দেখি এখন কি করা যায়!" ব'লে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে পা'য়ে পা'য়ে অগ্রসর হলেন।

দুই

চাটুয্যে মশায়ের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। গাঁয়ের আর কেউই খরচা দেওয়া সর্তেও কলকাতায় ওষুধ আনতে যেতে চায়নি। একমাত্র নটবরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এ উপকারটুকু করতে সম্মত হয়েছিল।

চাটুয্যে মশাই তাকে কলকাতা যাওয়া আসার সমস্ত খরচ, ওষুধের দাম, একখানি উইকএণ্ড রিটার্ণ টিকিট ও নানা উপদেশ দিয়ে, নিজে সঙ্গে করে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেছলেন। তারপর যা ঘটেছিল, তা হ'চ্ছে এই—

ট্রেণ হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছতেই রেলের কুলির দল হুড়মুড় ক'রে গাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো। নটবর কিছু বলবার আগেই একজন কুলি তুলে নিলে তার ক্যাম্বিশের প্রকাণ্ড হাত-ব্যাগটা। আর একজন টেনে নিলে তার নূতন সতরঞ্চ জড়ানো বিছানার বাণ্ডিলটা।

নটবর ভাবলে কলকাতার এই বুঝি দস্তুর! সে গম্ভীর হ'য়ে তার তালিমারা ছাতাটা বগলদাবায় নিয়ে কুলিদের পিছু পিছু চললো।

প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে টিকিট কালেক্টাব তাব টিকিট দেখতে চাইলে। নটবর টিকিট বার করতে পকেটে হাত দিলে, কুলিবা দরজায ভিড় না করে আগেই বেবিয়ে গেল। কিন্তু নটবর তার জামার সবকটা পকেট হাতড়ে উল্‌টে পাল্‌টে কোথাও আর টিকিট খানা খুঁজে পায় না। তার মুখ শুকিয়ে গেল! সর্বনাশ! তবে কি টিকিট তার খোয়া গেল? কিন্তু তাই বা কেমন কবে হবে? এইত চাটুয্যে মশায়ের দেওয়া ওষুধের কাগজ তার বাঁ-পকেটে রয়েছে! তাঁর যজমানের নামে দেওয়া চিঠি ডান-পকেটে রয়েছে! বটকৃষ্ট পালের ওষুধেব দোকানের ঠিকানাও বুক-পকেটে রয়েছে। টিকিট দিলে কি আর থাকতো না? নিশ্চয় চাটুয্যে মশাই তাড়াতাড়িতে টিকিটখানা তার হাতে দিতে ভুলেছেন,—

টিকিট কালেক্টার তাড়া দিলে—"টিকিট।"

হঠাৎ নটবরের মনে হ'লো চাটুয্যে মশাই কি আর এতটা ভুল করবেন! হয়ত টিকিটখানা পকেটে না রেখে সে ব্যাগের মধ্যে তুলে রেখেছে। কিন্তু ব্যাগ কই? ওই যাঃ—ব্যাগ বিছানা

যে তার ছুঁবেটা কুলিতে নিয়ে বেরিয়ে গেল! নটবর প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলো—"কুলি!"—"কুলি!"—কিন্তু সেই ভীড়ের মধ্যে গোলমালের ভিতর কুলিরা তার ডাক শুনতে পেলে না! সেও ঘাড় উঁচু করে, বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে ডিঙি মেরে দাঁড়িয়েও তার জিনিসপত্র সমেত কুলিদের স্টেশনের মধ্যে কোথাও দেখতে পেলে না।

টিকিট কালেক্টার আবার তাড়া দিল—"টিকিট।"

নটবর ঘেমে উঠতে শুরু করলে! গেটের মুখে রেলযাত্রী ও কুলির ভিড় লেগে গেছে। সবাই নটবরকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রমে প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে গেল। নটবর শেষ পর্যন্ত টিকিট দেখাতে না পারায় টিকিট কালেক্টার তাকে রেলওয়ে পুলিশের জিম্মা করে দিলে।

নটবর জোড় হাত করে বললে "হুজুর! টিকিটখানা বোধ করি ভুলে চাটুয্যে মশায়ের কাছে রয়ে গেছে আমি তাঁকে আজই পত্র লিখে আনিয়ে দেবো। আমাকে ছাড়ান দ্যান।

টিকিট কালেক্টার বললে—"ডবল ভাড়া দাও ত ছাড়ান পাবে, নইলে হাজতে যেতে হবে।"

রেলের পুলিশ দিলে নটবরকে এক রুলের গুঁতো। ফাটকে আটক থাকতে হবে শুনে নটবর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

এদিকে কুলিরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও নটবরকে বেরিয়ে আসতে না দেখে ভিতরে এলো তাকে খুঁজতে। এসে দেখে তার এই অবস্থা।

নটবর কুলিদের দেখে লাফিয়ে উঠে বললে—"হুজুর! ঐ ব্যাগের মধ্যে আমার টিকিট আছে!—আমি বিনা টিকিটে আসিনি! চাটুয্যে মশাই নিজে আমার টিকিট কেটে দিয়েছেন!"

নটবরকে ব্যাগ দেওয়া হ'ল! সে ব্যাগ খুলে তোলপাড় ক'রে ফেললে। হুঁকো, কলকে, টিকে, তামাক, গামছা তেলের শিশি, জলের ঘটী, খান-দুই কাপড় এবং ভদ্রলোকদের কামাবার সরঞ্জাম পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু টিকিটের উদ্দেশ মিললো না!

টিকিট কালেক্টার হেঁকে উঠলেন,—"ভাড়া দেবে না জেলে যাবে?—জোচ্চুরির জায়গা পাওনি?

নটবরের মুখ একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেলো! রেল-পুলিশ এই অবকাশে দিলে তাকে আবার এক গুঁতো। নটবরের চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো! সে ট্যাঁক থেকে তার টাকার থলিটী বার ক'রে ডবল ভাড়া গুণে বার ক'রে দিতে গিয়ে দেখে রেলের টিকিটখানি সে সযত্নে সেই থলির মধ্যে পুরে রেখেছে!

"পেয়েছি কর্ত্তা! পেয়েছি!—এই নিন"—বলে রিটার্ণ টিকিটখানি সে টিকিট কালেক্টারের হাতে তুলে দিতে রেলওয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিলে। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নটবর তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ছাতি বগলে কুলিদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিল। টিকিট কালেক্টার তাকে ডেকে টিকিটের রিটার্ণ হাফ্ ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বললেন "এটা হারালে আর দেশে ফিরতে পারবে না। হুঁসিয়ার হ'য়ে তুলে রেখো।"

তিন

রেলের কুলিরা তার মাল নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"বাসে তুলে দেবো না রিকশায় যাবেন?"

নটবর বললে—"আমি হেঁটেই যাবো, তোরা মোট নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।"

নটবর ঠিক করেছিল শহরের পথ ঘাট যখন সে চেনে না, কুলিদের সঙ্গে রাখলে ওরা তাকে চিনিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কুলিরা যেতে চাইলে না। তারা যত তাকে বুঝিয়ে বলে "আমরা স্টেশনের কুলি, বাইরে যাবার অর্ডার নেই।" নটবর বলে "আমায় বোকা পেয়েছো? আমায় নতুন লোক ঠাউরেছো? আমি কলকাতা শহর দেখিনি—বটে! এই সে বছর এসে আমাদের জমিদারের ছেলের বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেছি জানিস? নতুন বাজার থেকে তোদের মতন—অমন কত মুটে বড় বড় মোট নিয়ে পনেরো দিন ধরে সরকার মশাইয়ের পিছু পিছু এসেছে দেখেছি! নে'নে—চল—আর ন্যাকামি করিসনি।—"

অতঃপর কুলিরা তাকে 'বাউরা' সাব্যস্ত করে তার ব্যাগ বিছানা এক রিকসায় তুলে দিয়ে এক একটাকা বকশিস দাবী ক'রে বসলো।

নটবর দু' পয়সা থেকে শুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত চার আনা হিসাবে দুজনকে আট আনা আক্কেল সেলামী দিয়ে তবে অব্যাহতি পেলে, এবং জীবনে আর কখনো রেলের কুলির হাতে মাল তুলে দেবেনা বলে বেশ উচ্চৈঃস্বরেই প্রতিজ্ঞা করে রিকসায় উঠে বসলো।

রিকসাওয়ালা জানতে চাইলে কোথায় যেতে হবে? নটবর পকেট থেকে চাটুয্যে মশায়ের যজমানের নামে দেওয়া চিঠিখানি বার ক'রে ব'ললে "রাখাল মিত্তিরের বাসায় যাবে। চাটুয্যে মশাই এই চিঠি দিয়েছেন। তাদের ওখানেই গিয়ে উঠবো।"

রিকসাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে "উয়ো কাঁহা হবে?"

নটবর চটে উঠে বললে—"রাখাল মিত্তিরের বাসা চিনিসনা? চাটুয্যে মশায়ের যজমান—মস্ত লোক! তাকে তো কলকাতা শহরে সবাই চেনে?—"

রিকসাওয়ালা ভাবলে এটা অস্বীকার করা হয়ত বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সে এতক্ষণ হাতে খৈনী ডলছিল, এবার সেটা ঝেড়ে মুখে

ফেলে বললে—"হাঁ হুজুর। উয়োতো হাম্‌ভি জানছে।—লেকিন্ কৌন্ মহল্লাত' বাতাও!"

নটবর বললে—"আমি কি তোম্‌রা মল্লুক কা আদমি?—যে মহল্লা বাতাবো?—তোম কলকাতায় রয়তা—ঠিকানা জান্‌তা নেই?"

রিকসাওয়ালা বললে—"ঠিকানামে তো হাম জরুর পৌছায় দেউঙ্গা আপকো; লেকিন, কৌন ঠিকানামে যানে পড়েগা ইয়েভি ত বাতলানা চাই!"

নটবর রাখাল মিত্তির নামটা মনে রেখেছিল কিন্তু ঠিকানাটা ভুলে গেছলো। চাটুয্যে মশায়ের লেখা চিঠিখানার উপর থেকে অতি কষ্টে কষ্টে ঠিকানার পাঠোদ্ধার করে বললে—"শালা-খিয়া ধ-বৃমো-তলা জানতা নেই?"

রিকসাওয়ালা রুখে উঠে বললে "আলবাৎ জানতা ধরম্‌তলা!—মগর্ আপ্ শালা কেঁও বোল্‌তা?"

নটবর ঘাড় নেড়ে বললে—"হাঁ। ঠিক হায়, লে চলো সেখান মে।

"জী হুজুর!" বলে রিকসাওয়ালা ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটলো।

চার

ধর্মতলার মোড় পার হ'য়ে চৌরঙ্গীর ধারে এসে রিকশাওয়ালা জানতে চাইলে ডাইনে যেতে হবে না বাঁয়ে?

নটবর বললে—"তা কেমন ক'রে বলবো? আগে রাখাল মিত্তিরের বাড়ী দেখিয়ে দে। বাড়ী দেখলে তবে ত' বলতে পারবো ডাইনে কি বাঁয়ে?"

রিকসাওয়ালার এবার কেমন যেন একটু খটকা লাগলো! জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ী নেই জানতেহেঁ?

নটবর ভীষণ চটে উঠে বললে—নেই জানতে যদি, তবে আমাকে লেআয়া কাহে ? শালা কিয়া জান্‌তা—বল্লি কেন—

রিকশাওয়ালা আবার রুখে উঠলো। "বেল্লিক কৌন্ ? শালা কেঁও বোল্‌তা বাবু ? ধর্মতলা তো ইয়ে হায়, পুছো দশ আদমি কো—"

রিকশাওয়ালা রুখে উঠেছে দেখে নটবর ভয়ে নরম হ'য়ে বললে—"তবে আর গোলমাল করছিস্ কেন বাবা ? ঠিক জায়গায় যদি এনে থাকিস ত এইবার সোজা রাখাল মিত্তিরের বাড়ী নিয়ে চলনা।"

রিকশাওয়ালা বললে "রাখাল মিস্ত্রীকো ঘর হাম্ নেই জান্‌তা। কোন্ গলি বাতলাও !"

নটবর চটে উঠে বললে, "আমি কি রিকশা চালাই যে গলি ঘুঁজির খবর রাখবো—"

মিনিট দুই রিকশাওয়ালার সঙ্গে নটবরের বচসা শুরু হ'তে না হ'তেই তাদের ঘিরে চারিদিকে মেলাই লোক জড় হ'য়ে গেল ! রাখাল মিত্তিরের নামে দেওয়া চাটুয্যে মশায়ের চিঠিখানা নটবর তাদের দেখাতে সবাই রিকশাওয়ালাকে ধম্‌কে উঠলো "তোম্ হিঁয়া কাহে বাবুকে লেআয়া ? হাওড়াকো তরফ সালখিয়া ধরমতলামে লেযাও !"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডা সত্ত্বেও রিকশাওয়ালা নটবরকে নিয়ে সালখিয়া ধর্মতলায় আর যেতে চাইলে না। অগত্যা হাওড়া থেকে এস্‌প্লানেড পর্যন্ত আট আনা রিকশা ভাঁড়া দিয়ে ব্যাগ বিছানা নিয়ে নটবরকে রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হ'ল। পরোপকারী পথিক পাঁচজনে তাকে উপদেশ দিলে "আপনি নিমতলার ট্রামে কিংবা হাওড়ার 'বাসে' উঠে চলে যান, শীগ্‌গির হবে, এইখান থেকেই 'বাস্' পাওয়া যাবে—"

বলতে বলতে হুড়মুড় ক'রে একখানা 'বাস' প্রায় নটবরের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল'। কনডাক্টর হাঁকলে—"হাব্‌ড়া" ! "হাব্‌ড়া !"—

নটবর ব্যস্ত হ'য়ে তার ব্যাগ বিছানা নিয়ে 'বাসে' যেই উঠতে যাবে

কনডাক্টার তার হাত থেকে বিছানার বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে রাখতে গেল। কিন্তু, নটবর দৌড়ে গিয়ে তার বিছানা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো, "চৌকীদার! সিপাই! চোর! চোর! আমার বিছানা কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে!"—

বাসের 'টাইম' হয়ে গেছল্'। স্টার্টার সিটি দিতেই নটবরকে বিছানা-সমেত ছেড়ে দিয়ে বাসখানা বেরিয়ে চলে গেলো! রাস্তার লোকেরা তার ব্যাপার দেখে 'হো হো' ক'রে হেসে উঠলো। একজন ভদ্রলোক নটবরকে বুঝিয়ে দিলে যে 'মোট' নিয়ে ভিতরে বসবার নিয়ম নেই। বিছানা আপনার কেড়ে নেয়নি ওরা। বাইরে রেখে দিচ্ছিল। মোটটা বাইরে রেখে দেবেন, নামবার সময় ওরা আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেবে। নটবর বুঝতে পেরে অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, "যে আজ্ঞে মশাই!—কিন্তু, ও লোকটার মতলব ভাল ছিল বলে মনে হয় না!"

খুব জোরে 'হর্ণ্' দিতে দিতে সেই সময় আর একখানা 'বাস্' সামনে এসে পড়লো! নটবর আর কোন কথাটি না ব'লে কণ্ডাক্টরের হাতে নির্বিবাদে ব্যাগ বিছানা সমর্পণ ক'রে কেবল মাত্র তার ছাতাটি নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। নটবর সীটে বসবার আগেই বাস ছেড়ে দিলে। টাল খেয়ে নটবর সামনের সীটের ভদ্রলোকদের ঘাড়ের উপরে ঠিকরে গিয়ে পড়লো! কণ্ডাক্টর এগিয়ে এসে নটবরকে তুলে একটা খালি সীটে বসিয়ে দিলে। সামনের সীটের প্যাসেঞ্জার—দু'এক জন তার দিকে রোষকষায়িত নয়নে চেয়ে দেখলে। দু'একজন গোটা কতক কড়া কথাও শোনালে! নটবর ভ্যাবা গঙ্গারামের মত তাদের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

পাঁচ

নটবরের দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানা এসেছিল 'চার' নম্বর বাস্। যাচ্ছে চিৎপুর রোড দিয়ে বাগবাজার। গাড়ী প্রায় কলুটোলার মোড়ের কাছে এসে পড়েছে এমন সময় কণ্ডাক্টর নটবরের কাছে ভাড়া চাইলে।

নটবর বললে "রাখাল মিত্তিরের বাড়ীর সামনে নামবো, ক'আনা নেবে বলো ?"

বাস কণ্ডাক্টর জিজ্ঞাসা করলে "আপনি কি তবে বীডন ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে যাবেন ?"

নটবর এবার বিজ্ঞের মত সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ব'ললে, "তা যেতে হবে বৈকি ! রাখাল মিত্তিরের বাড়ী কি হেথা ? অনেক দূর বলেই ত' রিকসাওয়ালাটা যেতে চাইলে না !"

কণ্ডাক্টর বললে, "বুঝিচি, আপনি সেই ঘড়িওয়ালা বড় বাড়ীতে যাবেন ত ?—মিত্তির বাড়ী ?"—

নটবরের মনে পড়লো চাটুয্যে মশাই তাকে বলে দিয়েছিলেন বটে যে, রাখাল মিত্তিরের সদরে ঢুকে সামনের দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙানো আছে, রাস্তা থেকে দেখা যায় !—সে উৎসাহের সংগে বললে—"হেঁ গো ! ঘড়িওয়ালাই বাড়ী বটে ! তুমি ঠিক চিনেচো দেখছি !"

কণ্ডাক্টর পাঁচ পয়সা নিয়ে নটবরকে একখানা বাগবাজারের টিকেট কেটে দিলে।

গাড়ী বাগবাজারের কাছে আসতেই কণ্ডাক্টর প্রকাণ্ড এক ঘড়িওয়ালা বাড়ীর ধারে ব্যাগ বিছানা সমেত নটবরকে নামিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ ডাইনে মিত্তিরদের বাড়ী।"

ব্যাগ হাতে ও বিছানা বগলে নটবর মিত্তির বাড়ীর ফটকে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলে তাদের খাকী পোষাকপরা খাড়া সঙ্গীন আঁটা বন্দুক-

ধারী গুর্খা প্রহরীর কাছে! তার বিকট কণ্ঠের "কোন্ হ্যায় ?"—প্রশ্নের উত্তরে চমকে উঠে নটবর সেপাইকে একটা সেলাম ঠুকে বললে "পোণ্ডার চাটুয্যে মশায়ের বরাত নিয়ে এসেছি—আমি তাঁর সেবক নটবর দাস।"

"কেয়া মাংতা ?"

"বাবুজীর চরণ দর্শন করতে চাই।"

"কোন্ বাবু ? বড়া বাবু ? না ছোটা বাবু ?"

নটবর এবার একটু ভেবে একটা ঢোঁক গিলে বললে "বড়বাবু!" সেপাই বললে—"চারবাজে আও! আভি মুলকাত নেহি হোগা!"

নটবরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! সর্বনাশ! বেলা চারটের আগে বাবুর সংগে দেখা হবে না! সারাদিন কি না খেয়ে এই রোদে তাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে! একেই রেলগাড়ীতে কাল সারারাত সে একটিবারও চোখের পাতা বুজতে পারেনি, পাছে ঘুমিয়ে পড়লে গাড়ী হাওড়া ছাড়িয়ে চলে যায়, এই ছিল তার ভয়। তা'ছাড়া সকাল থেকে প্রাতঃকৃত্য হয়নি, পেটটা বেজায় মোচড় দিচ্ছে। নটবর ব্যাকুল হ'য়ে সেপাইকে বললে—"অনেক দূর থেকে আসছি মহারাজ। তুমি একবার বাবুজীকে খবর দাও যে বাবুজীর গুরুজী আমাকে পাঠিয়েছেন!"

সেপাই এবার বন্দুক উঁচিয়ে রুখে উঠলো—"যাও—ভাগো! চারবাজে আও!"

নটবর ভয়ে তিনহাত পেছিয়ে গেল! মনে মনে সেপাইয়ের মুণ্ডপাত করতে করতে ভাবলে এ হারামজাদা ত' ভারী ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি! হঠাৎ তার মনে হ'ল চাটুয্যে মশাইয়ের চিঠিখানা দেখালে হয়ত কাজ হতে পারে। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে চিঠিখানা বার করে সে দূর থেকেই সেপাইয়ের দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বললে, "চিঠি আছে সেপাইজী মহারাজ! বাবুর গুরুজীর পত্রিকা হ্যায়! তোম্ বড়

বাবুকে একবার দেখাও !”

গুর্খা সেপাই বন্দুক উঁচিয়ে আবার তাকে তেড়ে উঠলো “তফাৎ যাও ! চারবাজে মুলাকাত্ হোগা ।”

ভীত চকিত নটবরের হাত থেকে চিঠিখানা খসে ফটকের সামনে রাস্তার উপর পড়ে গেলো । নটবরের আর সেখানা কুড়িয়ে নিতে সাহস হ'লনা ! বেগতিক বুঝে একেবারে রাস্তার ওপারে গিয়ে তার ব্যাগ বিছানা ফুটপাতের উপর ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো । সেপাই তখন চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ফটকের ধারে ডাকবাক্সের মধ্যে ফেলে দিলে ।

ছয়

ও ফুটপাতে ছিল এক চায়ের দোকান । সেখান থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে নটবরের সংগে আলাপ জমিয়ে ফেললে । “বলি, ও মশাই ! রাস্তায় বসে পড়লেন কেন ? আসুন, ভিতরে আসুন, এক কাপ্ চা খান । আপনি মফঃস্বল থেকে আসছেন দেখছি ! বিপন্ন বলে মনে হচ্ছে ! কিছু যদি না মনে করেন—গরীবের এখানে মহাশয়ের পায়ের ধুলো”—ভদ্রলোককে আর বেশী কিছু বলতে হল না । নটবর বুঝলে যথার্থ ভদ্রসন্তান বটে । সে গুটি গুটি তাঁর সংগে চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো । তৃষ্ণায় তার বুক পর্যন্ত তখন শুকিয়ে উঠেছে ! এক কাপের জায়গায় তিন কাপ গরম চা সে বড় বড় চুমুকে নিঃশেষ করে ফেললে ! 'চা' যে এই মর্তলোকে স্বর্গের অমৃত তুল্য রসায়ন এটা যেন সে আজ প্রতি চুমুকে মর্মে মর্মে অনুভব করলে ! কিন্তু গরম চা পেটে পড়তেই নটবরের পেটটা এবার এমন অতিরিক্ত মোচড় দিয়ে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত সেই চা-ওয়ালার কাছেই অত্যন্ত সংকোচের সংগে নটবরকে তার বিপদের কথা জানাতে বাধ্য হতে হ'ল !

চায়ের দোকানের সংগেই ছিল "৺কালীতারা পবিত্র আর্য হোটেল। হিন্দু ভদ্রলোকদিগের সুলভে আহার ও বাসস্থান"—ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ নটবরকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

-নটবরের প্রাতঃকৃত্য ত' সুসম্পন্ন হলই, তা'ছাড়া স্নানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও সেখানে হ'য়ে গেল। সকৃতজ্ঞচিত্তে নটবর বার বার ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে "ভগবান আপনাকে মিলিয়ে না দিলে আমার কি দুর্দশাই না আজ হ'ত। ভাগ্যে আপনার হোটেলটি এখানে ছিল!"

ভদ্রলোক সবিনয়ে জানালে "এ সমস্তই আপনাদের; আমি কে? আমার কিছুই নয়! সবই 'প্রভু'র কৃপায়!"

নটবর একেবারে ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে উঠলো। মনে মনে বললে—এমন দেবতুল্য লোক বড একটা দেখা যায় না!

বেলা চারটের পর ভদ্রলোক নটবরকে ডেকে তুলে মিত্তির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন "সেপাই যদি এবেলা ঢুকতে না দেয় আপনি তার হাতে পানখাবার জন্য একটা টাকা বা নিদেন অষ্টগণ্ডা পয়সাও গুঁজে দেবেন, বাস্! একেবারে খোদ বডবাবুর সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেবে!"

কিন্তু, এবেলা সেপাই আর নটবরকে তেড়ে এলনা। বরং সংগে করে নিয়ে গিয়ে একেবারে সেরেস্তার গোমস্তাবাবুর সামনে হাজির করে দিয়ে বলে গেলো "এই আদ্‌মি সবেরে গুরুজী কি কুরযা লেকর আয়া থা!"

লালখেরো বাঁধানো বড় বড় মোটা খাতার মধ্যে গোমস্তাবাবু তখন নিবিষ্ট ছিলেন। নটবর গরুড় পক্ষীর মত জোড় হস্তে সেরেস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। বহুক্ষণ পরে তাঁর নাকের ডগায় ঝুলে পড়া কাণের পিছনে দড়ি বাঁধা চশমার ভিতর থেকে বড় বড় দুই ভাঁটার মত চোখ

তুলে নটবরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুই? কি চাস? নটবর প্রণাম জানিয়ে বললে—"আজ্ঞে অধীনের নাম সেবক শ্রীনটবর দাস, নিবাস—পোণ্ডা!"

গোমস্তাবাবু বললেন—"ও ও ও! তুমিই বুঝি সকালে রাখাল মিত্তিরকে লেখা দিগম্বর চাটুয্যের একখানা চিঠি এখানে এনেছো?"

নটবর আবার একটা দণ্ডবৎ ক'রে বললে—"আজ্ঞে!"

গোমস্তাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি কি নেশা করো? আফিম খাও? নিশ্চয়। বোধ করি গাঁজা গুলিও চলে?"

নটবর দাঁতে জিভ কেটে নাক-কাণ মলে বললে—"হুজুর এ কি বলছেন?"

গোমস্তাবাবু নটবরকে এক ধমক দিয়ে বললেন—"আলবাৎ নেশা করিস্, নইলে সালখের রাখাল মিত্তিরের এই চিঠি তুই বাগবাজারে এনে ছাড়লি কেন?" বলে চাটুয্যে মশায়ের চিঠিখানা ছুঁড়ে নটবরের গায়ের উপর ফেলে দিলেন।

নটবর চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললে—"এ চিঠি তবে কোথায় নে যেতে হবে বাবু? এ বাড়ী কি রাখাল মিত্তিরের নয়?"

উত্তরে গোমস্তাবাবু হাঁকলেন—"দ্বারবান!"

"জী হুজুর!" বলে খুব মোটা ভারী গলায় আওয়াজ দিয়ে যমদূতের মত চোহারা এক ভোজপুরী পালোয়ান এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। হাতে তার লোহার তার জড়ানো ও পিতলের গুলবসানো প্রকাণ্ড লম্বা এক পাকা বাঁশের লাঠি।

তাকে দেখে নটবরের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো!—

গোমস্তা বাবু নটবরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তাকে হুকুম দিলেন—"নিকাল দেও।"

গোটা দুই তিন ধাক্কাতেই নটবর একেবারে ফটকের বাইরে এসে

রাস্তার উপর ঠিকরে পড়লো !

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে জামা-কাপড়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে এদিক-ওদিক চেয়ে নটবর একছুটে রাস্তা পার হ'য়ে ও ফুটের হোটেলওয়ালার কাছে গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়লো।

হোটেলের সেই ভদ্রলোক নটবরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে "কিছু ভেবো না ভাই, আমি নিজে কাল তোমাকে সঙ্গে করে সালখের রাখাল মিত্তিরের বাড়ী নিয়ে যাবো।"

সাত

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত নটবর সেই হোটেলওয়ালা ভদ্র-লোককে পীড়াপীড়ি সুরু করলে—"চল দাদা, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি, রাখাল-বাবুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনি।"

ভদ্রলোক বলেন "হ্যা, এই যাই চলো, কিন্তু অনেকটা পথ! ফিরতে অনেক বেলা হ'তে পারে। এক কাজ করা যাক এসো। একেবারে সকাল ক রে স্নানাহার সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে বেরুই, কি বলো ? আমার আবার বেলায় খাওয়া মোটেই সহ্য হয় না। অম্বলশূল আছে কিনা !—"

এমন সময় একজন বেঁটে মোটা শ্যাম-বর্ণ লোক, পরণে একখানি আটহাতি ময়লা ধুতি, গায়ে একটি ছেঁড়া গেঞ্জী, গলায় তুলসীর মালা, কপালে ফোঁটা, গেঞ্জীর ভিতর থেকে পৈতেয় বাঁধা বড় চাবির গোছা ঝুলচে, কাঁধে ঝুলচে তারকেশ্বরের একখানি চওড়া পাড় রঙীন গামছা—ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই নটবরের সঙ্গী ভদ্রলোকটি কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ ক'রে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন।

ব্যস্ত হয়ে বললেন—এই যে আমি এখনি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম চলুন আমি এখনি দিয়ে আসছি—

বেঁটে মোটা শ্যামবর্ণ লোকটি বললে—হাতে হাতেই মিটিয়ে দিন না, আমি ত নিজেই এসে হাজির হ'য়েছি।

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনি যান না, আমি দিয়ে আসছি। দেখছেন আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি। একেবারে ঘরের ভিতর এসে চড়াও হয়েছেন যে!

বেঁটে মোটা কালো লোকটি একটু অপ্রসন্ন হয়েই গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—বেশী দেরী করবেন না, আমার বাজারের বেলা হচ্ছে।

নটবর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—উনি কে? কি চান?

হোটেলওয়ালা ভদ্রলোকটি অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন—ও আমার সরকার। একটা অসভ্য জানোয়ার! ওকে রাখা আর চলবে না দেখছি। আপনার সন্ধানে কোনো ভালো লোক আছে? দিতে পারেন? আমার এই হোটেল আর চায়ের দোকানটা দেখাশুনো করবে? আমি মাসে তিরিশ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি—তা ছাড়া—থাকা—খাওয়া অমনি পাবে। এ লোকটা বড় বিরক্ত করে। বলছি, নোট ভাঙাতে পাঠিয়েছি, একটু পরে বাজার যাবেন—ওর আর দেরী সইছে না! ঘরের ভিতর তেড়ে এসেছে। আপনার কাছে খুচরো পাঁচটা টাকা হবে? দিন ত পাপকে বিদেয় করে আসি। আমার লোক গেছে ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙাতে। এলেই আপনি পাবেন। বাজারের দেরী হয়ে যাচ্ছে বটে। এতগুলো লোক খাবে। বিশেষ কাছারীর বাবু যারা তাদের আবার সকাল সকাল রান্না হওয়া চাই-ই।"

নটবর তৎক্ষণাৎ পাঁচটি টাকা বার করে তার হাতে দিলে।

ভদ্র লোক বেরিয়ে গেল। নটবর ঘরথেকে তাঁর গলা শুনতে পেলে, তিনি—বলছেন—আমরা আজ একটু সকাল ক'রে খেয়ে বেরুবো। রান্না করতে বেলা করবেন না।

নটবর তখন সানন্দ উৎসাহে ভাবছিল—কলকাতা শহরে থাকা—খাওয়া—তার উপর মাস গেলে এককুড়ি দশ টাকা নগদ উপায়! তিরিশদিনে তিরিশ টাকা রোজগার! মন্দ কি? আমিই থেকে যাইনা কেন?—

আট

আহারাদির পর একঘুম দিয়ে উঠে হোটেলওয়ালা নটবরকে নিয়ে চললো এক ট্যাক্সী ভাড়া করে। গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কত টাকা আন্দাজ তোমার কাছে আছে? গাডীভাড়া-টা হবে তো? আমি আবার তাড়াতাড়িতে মণিব্যাগটা হোটেলে ফেলে এলুম।

নটবর বললে—তাতে আর কি হয়েছে? আমার পকেটে অন্ততঃ দু'কুড়ি পাঁচটাকা এখনো মজুদ। না না পূরো দু'কুড়ি পাঁচ হবে না। সকালে তোমায় তা থেকে পাঁচটাকা ধার দিয়েছি—মুটে ভাড়া—রিক্‌শা ভাড়া—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—ওই দেখো। তোমার পাঁচটাকা ত' দেওয়া হয়নি? বড্ড ভুল হয়ে গেছে? হোটেলে ফিরেই ওটা মনে ক'রে চেয়ে নিও দাদা! আমার ভারি ভুলোমন!

নটবর বললে—আচ্ছা! সে না হয় পরেই দিয়ে দিয়ো!—তার জন্যে আর কি?—

ভদ্রলোক বললেন—কিন্তু ভাই, কলকাতায় এলে তুমি, একদিন থিয়েটার দেখবে না, একদিন বায়োস্কোপ দেখবে না—এও কি হয়?

আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখেছো ? যাদুঘর দেখেছো ? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখেছ ?—পরেশনাথের মন্দির ?—

সবেতেই নটবর 'না' বলছে দেখে ভদ্রলোক উৎসাহিত হ'য়ে বললেন—এঃ! কিছুই দেখনি ভাই! তোমার জীবনই তবে বৃথা! চলো, আজ শনিবার আছে, তোমাকে ঘোড়দৌড় দেখাতে নিয়ে যাই! ঘোড়দৌড় দেখেছো ? দেখনি ? কী আশ্চর্য্য! বাজী ধরোনি কখনো ?—না ?—এঃ! কলকাতার কত লোক বড়লোক হ'য়ে গেল! ঘোড়দৌড়ের বাজি মারতে পারলে আর খেটে খেতে হবে না। পঁচিশ টাকায় পাঁচশো টাকা পাওয়া যাবে।

নটবর এবার মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো! কলকাতায় এসে যদি কিছু রোজগারই ক'রে না নিয়ে যেতে পারি তবে আর এতদূর এসে লাভ কি হলো ?—বললে—চলো, খোড়দৌড়েই যাওয়া যাক। বাজির টাকায় থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে " "শু করা যাবে।

ভদ্রলোক বললেন—সে আর বলতে! বাজির টাকায় নয়ত কি আমি ঘরের টাকা নষ্ট করে ওসব ছেলেমানুষী করতে দেবো ? পাগল হয়েছো ?

ঘোড়দৌড়ের মাঠে পৌছে দেখা গেলো ট্যাক্সীভাড়া উঠেছে চার টাকা বার আনা! হোটেলওয়ালা ভদ্রলোকটি নটবরকে ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে বললেন।

নটবর বললে—বলো কি দাদা! আমি সেদিন সারারাত ধ'রে শুয়ে বসে ট্রেণে চড়ে' এই এতটা পথ এসেছি—কোথায় পোণ্ডা—আর কোথায় কলকাতা—তার ভাড়া নিয়েছে মোটে সাড়ে তিন টাকা! সে কতবড় গাড়ী—কতবড় ইঞ্জিন—আর এই একরত্তি এটুখানি একখানা গাড়ী, চড়বামাত্র ফুরফুর করে এখানে এনে নামিয়ে দিলে—এর ভাড়া চায় কিনা পৌনে পাঁচ টাকা! এ হতেই পারে না! তুমি

জাননা ভাই, এসব কলকাতার জুয়াচুরি—আমাকে চাটুয্যে মশাই বার বার করে বলে দিয়েছেন! আমি পাঁচসিকের একপয়সাও বেশী দেবোনা!

ভদ্রলোক এবার নটবরকে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়লেন! অনেক করে তাকে বোঝালেন যে—রেলগাড়ীর সঙ্গে মটরগাড়ীর তুলনাই হয় না। রেল চলে কয়লার আঁচে, এ গাড়ী চলে দামী তেলের জোরে। রেল গাড়ী লাইন ছাড়া এক পাও চলতে পারেনা, কিন্তু এ গাড়ী বিনা লাইনে যেখানে খুশি যেতে পারে; এর এক একখানা রবারের বালিশ জড়ানো চাকার দাম এক একটা ঘোড়ার চেয়েও বেশী! রেলের চেয়ে এ গাড়ী দশ-বিশ গুন আগে ছোটে! তাই এর ভাড়াও রেলের চেয়ে দশ-বিশগুণ বেশী। এ গাড়ী একক্রোশ পথ এক টাকার কম যায় না—

নটবর সব শুনে বেশ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে—কিন্তু, বুঝে দেখো ভাই! এখনো আধ ঘণ্টা হয় নি আমরা গাড়ীতে উঠেছি! এর মধ্যে কি আমরা পাঁচকোশ পথ মেরে এলুম? পায়ে হেঁটে এলে যে প্রায় একবেলা লেগে যেত!—এসব কি ঠকবাজী নয়?—

হোটেলওয়ালা ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়ে তখন নটবরকে ট্যাক্সির মিটারটি দেখিয়ে বোঝাতে লাগলেন—প্রত্যেক গাড়ীতে কোম্পানী এই যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছেন; ঘণ্টায় কত মাইল গেলো, আর কত ভাড়া উঠলো, এই কলে তার নিশানা পাওয়া যায়। স্থতরাং মোটর গাড়ীর জুয়াচুরি করবার উপায় নেই!

নটবর তবুও ভাড়া দিতে ইতস্তত: করছে দেখে ভদ্রলোক বললেন—ভাড়াটা চুকিয়ে দাও, নইলে এখনি ও পুলিশ ডেকে আমাদের থানায় ধরে নিয়ে যাবে! রুলের গুঁতো খেতে খেতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে—

বাস্! আর কিছু বলতে হ'ল না! হাওড়া স্টেশনের রেল পুলিশের রুলের গুঁতোয় নটবরের পাঁজরা তখনও টাটিয়েছিল! সে এবার বিনা

বাক্যব্যয়ে পাঁচটি টাকা বার করে দিলে।

ভদ্রলোক তা' থেকে নটবরের অজ্ঞাতসারে মাত্র চারিটি টাকা ট্যাক্সিওয়ালাকে দিয়ে "থ্রি এ্যানাস অফ ইন দি রূপি"—বলে তাকে বিদায় করলে।

নয়

ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঢুকে মানুষের ভীড় দেখে নটবর অবাক হয়ে গেল। এত মানুষ এক জায়গায় সে কখনো দেখে নি।—লোকে একেবারে লোকারণ্য! রেস তখন শুরু হয়ে গেছে। ঘোড়া ছোটার সঙ্গে সঙ্গে জনতার উত্তেজনা ও কোলাহলেরও আর অন্ত নেই!

কৌতূহলী নটবর ঘোড়ার ছুট দেখবার জন্য ভীড়ের মধ্যে ঠেলে এগিয়ে চললো!

হোটেলওয়ালা ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—বন্ধু! কত টাকা বাজি ধরবে? এই বেলা ধরা চাই!—ঘোড়দৌড় সুরু হয়ে গেছে! শীগগির দাও—চল্লিশ টাকাই ধরিগে।

নটবর একটু ভেবে দশ টাকা তার হাতে দিয়ে বললে—এই দশ টাকারই বাজি ধরো দাদা—চল্লিশ ধরে কাজ নেই এ দানে! যদি হারি একেবারে নিঃসম্বল হতে হবে! আমার সারা জীবনের জমানো টাকা এ ;—

"বেশ তাই হবে!" বলে ভদ্রলোক একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই টাকা দশটা নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। নটবরও ভীড়ের মধ্যে ভেসে গেল!

বাজীর পর বাজী! উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে কোথা দিয়ে দিন কেটে গেল, নটবর কিছু টেরই পেলে না।

তারপর সেদিনের মত ঘোড়দৌড় শেষ হ'য়ে গেল! একে একে সমস্ত লোক চলে গেল। মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে এল! কিন্তু, নটবর

তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে। রয়েছে হোটেলওয়ালা ভদ্রলোকের দেখা নেই!

সামনেই নানারকম ছড়া কেটে 'অবাক জলপান' ও 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' বিক্রী করছিল। অনেকেই এক এক ঠোঙা কিনে খাচ্ছিল। দেখতে দেখতে নটবর আর লোভ সামলাতে পারলে না। তার রসনা জলসিক্ত হয়ে উঠলো। সেও তখন হাত বাড়িয়ে এক ঠোঙা অবাক জলপান নিলে। কিন্তু, পকেট থেকে পয়সা বার করে দিতে গিয়ে দেখলে—সর্বনাশ! পকেটে তার একেবারে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত কাটা! একটি আধলাও নেই!

সাড়ে বত্রিশভাজার ঠোঙাটা তার হাত থেকে খসে পড়ে মাঠের উপর ছড়িয়ে গেল। অবাক জলপানওয়ালা হাঁহাঁ করে উঠলো! দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে চারিদিকে অনেক লোক জড় হয়ে গেল! নটবর তখন 'হাউ-হাউ' ক'রে কাঁদচে!

হোটেল ওয়ালা ভদ্রলোকের তখনো দেখা নেই!

যথাসময়ে নটবর পুলিশের জিম্মায় বাগবাজারের সেই '৺কালীতারা আর্য হোটেলে' এসে উপস্থিত হল। সেখানে সেই ভদ্রলোকের খোঁজ করে জানা গেল—বেলা দুটোনাগাদ তিনি হোটেলে ফিরে এসে নটবরের থাকা খাওয়া বাবদ দুদিনের বারো আনা হিসেবে দেড়টাকা চুকিয়ে দিয়ে একখানি রিক্‌শা ডেকে তার ব্যাগ বিছানা নিয়ে চলে গেছেন—হোটেলের সঙ্গে নাকি তার কোন সম্পর্ক নেই! হোটেলের মালিক সেই মোটা বেঁটে কালো লোকটি। তিনি নটবরকে দেখেই সনাক্ত করে বললেন—হ্যাঁ, এই লোকের সঙ্গেই কাল সকাল থেকে এসে তিনি আমার হোটেলের একখানি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিনি নে!…"

গুপী কবিরাজ

রায় বাহাদুর গোপাল রায় দুর্দান্ত জমিদার। কিন্তু, রসিক বলেও তাঁর সুনাম আছে।

তিনি তাঁর বাড়ীর নাম দিয়েছিলেন 'উজ্জয়িনী-প্রাসাদ'। আর, বৈঠকখানায় বসিয়েছিলেন এক নবরত্নের সভা!

গুপীকবিরাজ ছিলেন এই সভার নবরত্নের মধ্যে একজন। আয়ুর্বেদে নিজের যে গভীর জ্ঞান আছে এবং চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি যে অদ্বিতীয়—এসম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনো সন্দেহই ছিল না। কিন্তু ভূস্বামী গোপাল রায় মমে মনে সেটা মেনে নিলেও, মুখে কখনই তা স্বীকার করতেন না। বরং গুপীকবিরাজকে দেখলেই আয়ুর্বেদকে ব্যঙ্গ করা তাঁর রসিকতার একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

কবিরাজী চিকিৎসাটা যে একেবারেই ফাঁকি, রায় বাহাদুর গোপাল রায় রহস্যচ্ছলে সেইটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন। আর গুপীকবিরাজ ক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রাণপণে তার প্রতিবাদ করতেন। আমরা যে আজ অনেকের মুখেই শুনি 'বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ' বা 'ইষ্টকাদি বটিকা'—এ সমস্তই সেই স্বনামধন্য জমীদার রায় বাহাদুর গোপাল রায়ের মৌলিক রচনা।

গুপীকবিরাজের সঙ্গে গোপাল রায়ের বাকযুদ্ধ যদিও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু, যে-কোনো-পরিচিত আত্মীয় বন্ধুর দুঃসাধ্য রোগের সংবাদ পেলেই শ্রীযুক্ত গোপাল রায় তৎক্ষণাৎ তাদের অনুরোধ করতেন গুপীকবিরাজের চিকিৎসায় থাকতে। কারণ, তিনি নিজের ও তাঁর পরিবারস্থ সকলে গুপীকবিরাজের চিকিৎসারই অধীন ছিলেন। রায় বাহাদুর গোপাল রায়ের জমিদারী সেরেস্তায় গুপীকবি-

রাজের মাসিক বেতন তো বরাদ্দ ছিলই, তাছাড়া, পূজা-পার্বণে, আপদে-বিপদে গোপাল রায়কে একটু জানালেই তিনি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতেন।

জমিদারী পরিদর্শনেই হোক, কলকাতা শহরে রং তামাসা দেখতেই হোক্ বা পশ্চিমে কোথাও হাওয়া বদলাতেই হোক, যখনই তিনি গ্রামের বাইরে যেতেন, আর কেউ সঙ্গে যাক্ বা না যাক, গুপীকবিরাজকে তার পুঁথিপত্র আর ঔষধের পেটিকা সঙ্গে নিয়ে বাবুর সহযাত্রী হ'তেই হ'তো।

এ হেন গুপীকবিরাজকে নিয়ে একদা প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার রায় বাহাদুর গোপাল রায় মহাশয় সপরিবারে গেলেন পশ্চিমের এক স্বাস্থ্যকর শহরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য।

ছোট শহর। বাঙালীর বসবাস সেখানে একরকম নেই বললেই হয়। কেবলমাত্র একজন বাঙালী আছেন। তিনি হ'চ্ছেন সেখানকার মহকুমা হাকিম, অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বিলাত ফেরত মানুষ। আই-সি-এস দের চালেই থাকেন, অর্থাৎ সাহেবী কেতায়।

গোপাল রায় এই সব নেটিভ সাহেবদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। সুতরাং বিদেশে এক পাড়াতে বসবাস করা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম ঘোষের সঙ্গে ওঁদের আলাপ পরিচয় ঘটে উঠলো না।

গুপী কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে রায় বাহাদুর প্রত্যহ দু'বেলা নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতেন। নদীর উঁচু বাঁধটার উপর যে চওড়া রাস্তা ছিল সেখানে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগতো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও সেই-খানেই বেড়াতেন, কিন্তু পদব্রজে নয়। মস্ত এক মোটরকারে। উর্দিপরা ড্রাইভারের পাশে বসে থাকতো মাথায় জরিদার লাল টুপি কোর্টের আর্দালি। পাগড়ি আঁটা পশ্চিমা লোকগুলোর দু'ধারি ঘন ঘন সেলামের ভীড়ের মধ্যে দু'জন নির্বিকার বাঙালীর মুখ দেখে মিঃ এম ঘোষ তাঁদের

সঙ্গে একটু আলাপ করতে উৎসুক হয়ে-ছিলেন। কিন্তু উপায় ছিল না। রাজকীয় উচ্চপদের মর্যাদা ছিল প্রধান বাধা। তিনি গাড়ী থেকে প্রত্যহই তাঁদের দিকে চেয়ে দেখতেন। তাঁরাও ম্যাস্ট্রেট সাহেবের গাড়ীর হর্ণ পেলেই তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে দেখতেন। পরস্পরের চোখে চোখে মিলত-। কিন্তু ওই পর্যন্ত!

রায় বাহাদুর গোপাল রার বলতেন—কবরেজ! এ বাঁদরটাকে ভাল লোক বলেই মনে হয়।

গুপী কবিরাজ বলতেন—হ্যাঁ, দাঁত-খিচুনি নেই! হয়ত' কোমরে দড়ি বেঁধে খেলা দেখানো চ'লতে পারে!

বাড়ী ফিরে তাঁরা বসতেন দাবা খেলতে। যতক্ষণ না বাড়ীর ভিতর থেকে স্নানহারের তাড়া আসে—খেলা চলতো। একদিন কেমন ক'রে কবিরাজ মহাশয় 'বিড়ালের ভাগ্যে সিকে ছেঁড়া গোছ' রায়বাহাদুরকে গজের কিস্তি দিয়ে প্রায় যখন মাত্ ক'রে এনেছেন—এমন সময় বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়ালো এক লম্বা চওড়া উর্দিপরা আর্দালি। মস্ত এক সেলাম ঠুকে বললে—হুজুর! হাকিম সাবনে ভেজা—আপ্‌কো বাগীচা সে থোড়া গাংদাড়া লেযানে কো—

দাবা খেলায় তাঁর পরাজয় অনিবার্য বুঝে রায় বাহাদুর অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস্ করছিলেন। আর্দালীর আগমনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন—ও কবরেজ! এ যে দেখছি তোমার সেই 'ডেপুটী হাকিম'! কি চায় শোন না!

ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দালিদের গুপী কবিরাজ 'ডেপুটী হাকিম' বলে উল্লেখ করতেন। কবিরাজ সেই সময় দাবাবড়ের ছকের উপর সজোরে গজ টিপে ধরে হেঁট হ'য়ে বলে উঠলেন—এই নিন—এই—কিস্তি! এবার আর রক্ষা নেই! স্বয়ং দুই অশ্বিনীকুমার স্বর্গ থেকে নেমে এলেও বাঁচাতে পারবে না আপনাকে!

আরে রাখো তোমার কিস্তি ! খেলা অনেক্ষণ জ্বলে গেছে। এখন এই 'ডেপুটী হাকিম' কি চায় দেখো !

গুপী কবিরাজ সিংহনাদে বলে উঠলেন—খেলা জ্বলে গেছে মানে ? এ একেবারে চকবন্দী কিস্তি !—একে জ্বালায় কে ?—হর কোপানলেও এ জ্বলবে না ?

—কিন্তু, হাকিমের কোপানল থেকে বোধ হয় তোমাকে আর রক্ষা করতে পারা গেল না ! হাকিম সাহেব 'গাংদাড়া' চেয়ে পাঠিয়েছেন—সেটা আবার কি পদার্থ হে ? শীগগির বার করে দাও।

গুপী কবিরাজ একবার আর্দালির মুখের দিকে, একবার রায় বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—সে তো এক প্রকার মৎস্য। বঙ্গদেশ ছাড়া সেরূপ সুস্বাদু মৎস্য ভারতের কুত্রাপি পাওয়া যায় না—

—থামো ! তুমি যে একেবারে তৃতীয় মানের ভূগোল পরিচয় আওড়াতে সুরু করে দিলে !— এই বলে রাযবাহাদুব নিজেই আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কি তোমারা ঘরমে মছলি নেই আয়া ?—

—নেহি নেহি, জী !— মছলিসে কেয়া কাম ? হাম তো আপকো পাস্ 'গাংদাড়' মাঙ্‌নে আয়া হুজুর !—বলে আর্দালি এক সেলাম ঠুকলে।

রায় বাহাদুর ক্ষণকাল কি ভেবে বললেন—উয়ো দাল তো হাম লোক নেহি খা'তা। মুঙ্‌কা দাল মাঙো তোঁ দে সেক্‌তা !

আর্দালি আবার এক সেলাম ঠুকে বললে—জী হুজুর ! উয়ো তো আপকো কহনা ঠিক হায় ! লেকিন্ 'গাংদাল' তো ডাউল নেহি ; উয়ো এক পত্‌তর—

গুপী কবিরাজ বলে উঠলেন—হাঁ হাঁ, ঠিক হায় ! উয়ো পথর্ কো হাম লোক বোলতা 'জগদ্দল পাথর্ !—' উয়ো বহুত ভারি—আউর—'

আর্দালি এবার করুণ ভাবে বললে—নেহি হুজুর ! উস্‌কো রস

নিকালকে—

রায় বাহাদুর চকিত হ'য়ে প্রশ্ন করেন—এ বলে কি কোবরেজ? পাথরের রস বার করে এরা! বড় জবর হাকিম তো!—

গুপী কবিরাজ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন—না না, থামো একটু রায় বাহাদুর! নিশ্চয় শুন্‌তে ভুল হয়েছে। কি কথাটা ব'ললে হে? গাংদাল? রস নিকাল্‌ তা?—

—জী হুজুর!

—হয়েছে রায় বাহাদুব!—বেটা কাঁঠাল চাইছে! বুঝেছো? ওদের তুর্কী ভাষায় কাঁঠাল হ'য়ে উঠেছে 'গাংদাল'!

—ভাষাতত্ত্বে যে আমার খুব বেশী দখল নেই, একথা স্বীকার করি কোবরেজ! তবে এই কার্তিক মাসে যখন একটা ইঁচড় খুঁজলেও পাওয়া যায় না, তখন হাকিম মানুষ হয়ে যে তিনি কাঁঠাল পেড়ে অনবার হুকুম দিয়েছেন, এমনত মনে হয় না!—এই ব'লে রায় বাহাদুর গোপাল রায় মনোযোগ দিয়ে দাবা-বড়েগুলি [illegible]ঁর বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে রাখতে শুরু করলেন।

গুপী কবিরাজ নিজের ভুল বুঝে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। চটে উঠলেন আর্দালির উপর। ধমক দিয়ে বললেন—যাও, তুমি বাবুর কাছে লিখে নিয়ে এসো।

গোপাল রায় তাড়াতাড়ি গুপী কবিরাজের একটি হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন—আরে সর্বনাশ! তুমি ডোবালে দেখছি! ও কোবরেজ। 'বাবু' কি হে?—হাকিম সাহেব! নাঃ! এত করেও তোমাকে আর মানুষ করতে পারলুম না! দেখছি চরকঋষি তাঁর সুশ্রুতে ঠিকই লিখে গেছেন যে—আয়ুর্বেদের গদাঘাতেও গাধা পিঠে ঘোড়া করা যায় না!—

—মুর্খ আর কাকে বলে?—আরে চরকও ঋষি—সুশ্রুতও ঋষি—এও যদি না জানো, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কথা বলো কেন?—গুপী কবিরাজ

রোষকষায়িত নেত্রে গোপাল রায়ের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আর্দালি এবার অধৈর্য হ'য়ে জানতে চাইলে—হুজুর! গাংদাল মিলি?

গোপাল রায় আর বাক্যব্যয় না ক'রে একখানা চিরকূটে লিখে ফেললেন—মান্যবরেষু! রোকায় নমস্কার জানিবেন। ভবদীয় আর্দালি আসিয়া মদীয় সকাশে যাহা প্রার্থনা করিতেছে তাহা দুর্বোধ্য বিধায় দিতে পারিল্যাম না। সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলে অনুরোধ পালনে যথাসাধ্য যত্নবান হইব। ইতি।

বিনীত

শ্রীগোপালদাস রায়

চিরকুটখানি আর্দালির হাতে দিয়ে রায় বাহাদুর বললেন—যাও, সাবকো দেখলাও, আর সিধা জবাব লে-আও।

আর্দালি সেলাম করে 'বহুৎ আচ্ছা হুজুর' বলে চলে গেল।

খানিক পরেই হুস্ হুস্ করে এক মস্ত মোটর এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। গুপী কবিরাজ উঁকি মেরে দেখে ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন—রায়বাহাদুর! এ যে খোদ বড় হাকিম এসে হাজির দেখছি! ব্যাপার কি?

গোপাল রায় বললেন—ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে। আর্দালির সামনে তুমি হাকিম সাহেবকে 'বাবু' বলেছো—আর কি রক্ষে আছে?

মহকুমা হাকিম মিঃ এম ঘোষ ঘরের মধ্যে এসে হাত জোড় করে উভয়কে নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করতে এলুম, মাপ করবেন।

গোপাল রায় ও গুপী কবিরাজ উভয়ে মিলেই সমস্বরে বলে উঠলেন—বিলক্ষণ। আপনি এসেছেন—এ আমাদের পরম সৌভাগ্য! বহুদিন পরে বাংলা কথা শুনে বাঁচলুম। আসুন আসুন, বসুন! আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার ইচ্ছে হয়েছিল খুবই, কিন্তু জেলার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তার কাছে ঘেঁসতে সাহস হয় নি।

—সেইটেই তো আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মশাই। তা' পর্বত যখন মহম্মদের কাছে না আসেন, তখন মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হয়।—বলে মিঃ এম ঘোষ খানিকটা প্রাণখোলা হাসলেন। তারপর বললেন—যে কাজে এসেছি, বলি—আমার স্ত্রী আজ প্রায় ছ'মাস হ'ল ক্রনিক ডিসেণ্ট্রিতে ভুগছেন। অনেক চিকিৎসা করলুম, কিছুতেই কিছু হল' না। তিনি এখন প্রায় একরকম অন্তিম-শয্যায়। খাদ্য শুধু বার্লি ওয়াটার আর গাঁদলের জ্যুস। এদেশে লাখটাকা খরচ করলেও আপনি গাঁদাল পাতা কোথাও পাবেন না। একমাত্র আপনাদের এই বাড়ীতেই একটি গাঁদাল লতা আছে—তারই গুটি কয়েক করে পাতা আমাদের মাঝে মাঝে ভিক্ষা দিতে হবে।

গুপী কবিরাজ ও গোপাল রায় উভয়েই সমস্বরে বললেন—ও-ও-ও! বুঝিছি এইবার। আপনার আর্দালি-উক্ত 'গাংদাড়' পদার্থ যে কি তা' আমরা দু'জনে বহু গবেষণা ক'রেও স্থির করতে পারি নি। যাক। এখন ব্যাপারটা জলের মত বোঝা গেল।—

তাহ'লে আমি এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি?—

রায় বাহাদুর হাত জোড় ক'রে বললেন—বিলক্ষণ, তাকি হয়? ওরে হরে!—চা' নিয়ে আয় শীগগির!—আসুন,—পান ইচ্ছে করেন কি? বলে তাঁর মস্ত রূপোর ডিবেটা হাকিম সাহেবের সামনে এগিয়ে ধরলেন!—

মিঃ ঘোষ বললেন—মাপ করুন, আমি পান খাইনে। আর এত বেলায় চা খাওয়াও চলবে না।

—তবে এক ছিলিম তামাক দিক!

—তামাকের মধ্যে নস্য নেওয়াটা এখনো আছে, আর সব ছেড়েছি—

গুপী কবিরাজ গদগদ্ হয়ে বললেন—গুড়ুক ছেড়েছেন? আপনি ধন্য!

রায়বাহাদুর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন—একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই!—কবিরাজী চিকিৎসায় আপনার বিশ্বাস আছে কি ?—

মিঃ ঘোষ বললেন—দেখুন, আয়ুর্বেদকে আমি পঞ্চম বেদ বলে মানতে রাজি আছি ··কিন্তু, কবিরাজ মহাশয়দের আমি দূর থেকে দণ্ডবৎ করতে চাই ! ..

গুপী কবিরাজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কি যেন একটা কিছু ব'লতে তিনি উদ্যত হচ্ছিলেন, কিন্তু রায়বাহাদুরের কঠিন চিমটির ইসারায় যন্ত্রণাব্যঞ্জক বিবর্ণ মুখে চুপ করে রইলেন।

রায়বাহাদুর বললেন—বেশ কথা! কিন্তু, আপনি তো অন্য চিকিৎসা করে হতাশ হয়েছেন। আপনার স্ত্রীর জীবনের আর কোনো আশাও নেই বলছেন—সুতরাং, এ ক্ষেত্রে একবার কবিরাজী ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ? যদি উপকার না দেখেন, ছেড়ে দিতে কতক্ষণ ?···

—আপনি যা' বলছেন ঠিক। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় ভাবেননি যে, এভাবে যদি বা তিনি আরও দু'দশদিন বেঁচে থাকেন, কোন কবিরাজ মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি পড়লে, তাঁর শেষ দিন হয়ত আরও সত্বর ঘনিয়ে আসবে !

গুপী কবিরাজকে এর পর আর ঠেকিয়ে রাখা রায়বাহাদুরের পক্ষেও দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠলো ! অতি কষ্টে বজ্রটিপুনী দিয়ে এবারকার মতোও কোনও রকমে কবিরাজকে থামিয়ে রেখে রায় বাহাদুর বললেন—আমার জানা একজন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ও ভৈষজ্য বিদ্যায় বিশারদ কবিরাজ আছেন।—আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তাহ'লে আমি একবার তাঁকে পাঠিয়ে দিই। কারণ, ক্রনিক আমাশা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় তিনি একেবারে ধন্বন্তরী !

—তা' বেশত ! পাঠিয়ে দেবেন, আয়ুর্বেদকে আমি একটা 'চান্স'

দিতে রাজি আজি।

মিঃ ঘোষ একথা বলামাত্রই রায় বাহাদুর গুপী কবিরাজকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ইনিই সেই মহাপুরুষ! এঁর নাম হয়ত শুনে থাকবেন, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! এঁকে নাগার্জুনের সাক্ষাৎ পিতামহও বলতে পারেন! বহু কঠিন দুরারোগ্য রোগ ইনি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য ক'রে আমাদের সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছেন!

—তাই নাকি! তবে তো মশাই আপনাকে এ ভার নিতেই হবে। আমার স্ত্রীকে যদি আরোগ্য করতে পারেন, আমি আপনাকে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দেবো।

—হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেও আপনার স্ত্রীর চিকিৎসার ভার আমি গ্রহণ ক'রতে সম্মত নই! ব'লে গুপীকবিরাজ উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন—

রায় বাহাদুর 'হাঁ হাঁ' করে [illegible]লেন—সে কি কবিরাজ, এমন অন্যায় কথা বলছ কেন?

কবিরাজ মশাই তীব্রকণ্ঠেই বললেন—ন্যায়-অন্যায় বিচারশক্তি আপনাদেরই নেই! অন্যায় কথা আমি বলছি, না—আপনারা বলছেন? কবিরাজের উপর যাঁর শ্রদ্ধা নেই—তাঁর পত্নীকে চিকিৎসা করবে যে, সে আহাম্মুক!

মিঃ ঘোষ বললেন,—আহা,—আপনি অত চটছেন কেন?—আমি আপনার ন্যায় গুণীশ্রেষ্ঠ কবিরাজদের সম্বন্ধে কিছু বলিনি। তথাকথিত সব হেতুড়ে কবিরাজদের কথাই বলেছি; যারা দু'দিন মাত্র আপনাদের কাছে খল মাড়তে শিখেই মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন! আপনি চলুন আমার সঙ্গে, গাড়ী রয়েছে, একবার দেখে আসবেন চলুন। আবার আপনাকে পৌছে দিয়ে যাবো।

রায়বাহাদুরও বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অগত্যা গুপী

কবিরাজ তাঁর চাদরখানি কাঁধে ফেলে হাকিমসাহেবের সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। পাঁচশো টাকা প্রাপ্তির সুযোগটাও তো তুচ্ছ নয়!

দুই

বাংলো ধরণের বাড়ী। ইংরাজী ফ্যাশনে সাজানো। তারই একধারের একখানি ঘরে, মেঝেয় বিছানা পেতে হাকিমের স্ত্রী শুয়ে আছেন। হিমশীর্ণ হেমন্তের লতার মতো তাঁর ক্ষীণ তনু যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে। পায়ের কাছে বসে ছোট একটি মেয়ে—বছর আষ্টেক হবে। হিন্দুস্থানী আয়া মাথার কাছে বসে বাতাস করছে। ঘরের এক-পাশে স্প্রীংয়ের গদি আঁটা দামী খাট পড়ে রয়েছে। ঘরের অন্যান্য আসবাবও মূল্যবান। রোগিণীকে দেখে গুপী কবিরাজের বুঝতে বাকী রইল না যে একদিন এই মেয়েটি পরমা সুন্দরী ছিল। কঠিন রোগ অসময়ে তার রূপ যৌবন হরণ করেছে। বর্ণ মলিন। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ! রোগিণী তার শীর্ণ হাত তুলে কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম জানালে।

—দেখি মা, তোমার হাতটা একবার। বহুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে গুপী কবিরাজ বললেন—কতদিন এমন হ'য়েছে মা?

হাকিম সাহেব উত্তর দিলেন—বলিছি ত' আপনাকে প্রায় ছ'মাস হল!

—কি খেতে দিচ্ছেন এ কে?

—কি আর খাবেন? সামান্য জলবার্লি তাও পেটে তলায় না! দিনে তিরিশ চল্লিশ বার দাস্ত। পেটের যন্ত্রণায় অস্থির। কিছু খেলেই যাতনা বাড়ে। বমিও মাঝে মাঝে হয়—এই দেখুন না, খাটে শোয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। এত বেশী দুর্বল যে খাট থেকে আর ওঠা নামা ক'রতে

পারেন না। গাঁদালের জুসটা মধ্যে মধ্যে দিই বটে, কিন্তু, তাও হজম করতে পারেন না।—

—হুঁ, প্রায় শেষ করে এনেছেন দেখছি! বলে গুপীকবিরাজ উঠলেন। বললেন—কিন্তু, এখনও হাতের বাইরে যায়নি! আপনার স্ত্রী আরোগ্য হবেন নিশ্চয়। আমি ওঁর চিকিৎসা করবো। কিন্তু, যে ওষুধটি যখন যেভাবে খাওয়াতে বলবো, ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে তা খাওয়াতে হবে। রোগিণীর যেরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করবো নির্বিচারে তা পালন করতে হবে। এতে যদি রাজি থাকেন তো বলুন। আমার চিকিৎসার উপর আপনারা কেউ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না আমাকে কথা দিন—

মিঃ ঘোষ বললেন—একথা আপনার বলাই বাহুল্য! যখন উনি আপনার চিকিৎসায় থাকছেন, তখন আপনি যা আদেশ করবেন তা বর্ণে বর্ণেই প্রতিপালিত হবে।

—উত্তম। তাহ'লে আমি এখনি গিয়ে ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি! আর পথ্যের ব্যবস্থা এইখানেই আপনাকে বলে যাই। বলে কবিরাজ রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খেতে তোমার ইচ্ছে হয় মা?

ক্ষীণকণ্ঠে রোগিণী বললেন—কিছুই না বাবা! ক্ষুধা একেবারে নেই, এবং সবেতেই বিষম অরুচি!

—আচ্ছা, কাঁচা তেঁতুলের টক দিয়ে পুঁটি মাছের অম্বল, আর দুটি গলাভাত? খেতে ইচ্ছে হয়?

রোগিণী ঘাড় নাড়লেন—হয়।—ভাত যে কত দিন মুখে দিই নি মনে নেই—

—তা'ত বটেই! না খেলে কি মানুষ বাঁচে মা? আচ্ছা; রাত্রে যদি তোমাকে বেশ গরম গরম ফুলকো লুচী মিছরীর রসে ডুবিয়ে খেতে দিই—খাবে?

রোগিণী আবার ঘাড় নেড়ে জানালেন—খাবেন।

—সকালে একটু সুজীর হালুয়া, কিস্‌মিস্‌, বাদাম, তেজপাতা, মরীচ, ছোট এলাচ, কর্পূর দিয়ে—কেমন?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এলো—"হুঁ"! রোগ-পাণ্ডুর বিবর্ণ ওষ্ঠে একটু সলজ্জ মৃদু ম্লান হাসি।

গুপীকবিরাজ দেখে খুসী হলেন। বললেন—বিকেলে, টাটকা ঘরে তৈরি ছানা—কাশীর চিনি দিয়ে যতটুকু পারো খেয়ো মা, বুঝলে?

রোগিণী বললেন—আচ্ছা!

কিন্তু, পথ্যের ব্যবস্থা শুনে হাকিমের দুই চোখ কপালে উঠে যাবার মত অবস্থা।

গুপীকবিরাজ চলে যাবার সময় হাকিম সাহেব তাঁর পিছু-পিছু ফটক পর্যন্ত এলেন এবং সকল সংকোচ ঠেলে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহ'লে কি খেতে দেওয়া হবে ওকে কবিরাজ মশাই?

—নাও কথা! সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার ভার্যা? পথ্যের কথা তো এইমাত্র বলে এলুম। মনে না থাকে লিখে নিন!...

—সে কি? ওই হালুয়া-ছানা—ভাত-লুচি—তেঁতুলের টক—? সত্যি কি ঐ সব খেতে দিতে বলেন?—না রোগীকে ভোলাচ্ছিলেন—?

—ভোলাবার জন্য হ'লে এলাচদানা, মিছরী—কুমড়োর মেঠাই—বেলের মোরব্বাই বলতুম! যা যা বলে গেলুম, তার প্রত্যেকটি ওঁকে খেতে দেবেন।

—এ কি বলছেন কবিরাজ মশাই?—যার বার্লি হজম হচ্ছে না—

গুপীকবিরাজ এবার একটা দাবড়ি দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, তাঁর পোলাও হজম হবে। যান, বেশী তর্ক করবেন না। যেমন বলে গেলুম সেই রকম দিনে চারবার খেতে দেবেন।

গুপীকবিরাজ চলে গেলেন।

কিন্তু, হাকিম সাহেব পড়লেন অকূল পাথারে।

* * *

তিনদিন পরে হঠাৎ একদিন রাত্রে হাকিম সাহেবের বাড়ী গুপী কবিরাজের ডাক পড়লো! এখনি তাঁকে যেতে হবে…হাকিম সাহেবের স্ত্রীর নাকি অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে! আজ রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ!

রায় বাহাদুর শুনে বললেন—জানি, একটা কাণ্ড বাধাবে তুমি! তোমার হাতে যখন পড়েছে, তখন হাকিমের স্ত্রীটিকে কি আর বেচারী ফিরে পাবে? তোমাদের আয়ুর্বেদ, লোকের আয়ুর্বধেরই ব্যবস্থা করে দেখছি!

ভীষণ চটে উঠে গুপীকবিরাজ বললেন—তোমার মত অকৃতজ্ঞ লোকের তাই করাই উচিত বটে! নেহাৎ হিন্দুর অবধ্য ও মুস্লিমের অখাদ্য বলেই তুমি বেঁচে আছো!

—তাতো আছি!—এখন ভদ্রলোকের স্ত্রীটির যা হয় কিছু গতি করো! সরে পড়বার যোগাড় যে! হাতে কি শেষ দড়ি পড়বে?

* * * *

কাঁধে চাদর ফেলে গুপীকবিরাজ বেরিয়ে গেলেন তাঁর ঔষধের পেটিকা নিয়ে। অনেক রাত্রে যখন ফিরে এলেন রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখে এলে হে?

গুপীকবিরাজ গুম্! মুখে কোনো কথা নেই।

গোপাল রায় বললেন—আজ রাত্রিটা টিকবে তো? দোহাই বাবা তোমার আয়ুর্বেদের—তোমার চরক-সুশ্রুতের পায়ে পড়ি—আজ রাত্রে আর শ্মশানে ছুটিয়োনা। আর কোন বাঙালি নেই এদেশে—বুঝতেই পারছো তো, তোমার খুন তোমাকেই ঘাড়ে করে পোড়াতে যেতে হবে। আর শ্মশান কি হেথা? সেই নদীর ধারে। মাইল দুই তিন হাঁটতে

হবে। দিনে হলেও বা কথা ছিল। রাত্রে আমি পারবো না।

গুপীকবিরাজ এবার কথা কইলেন—আজ রাত্রে ও রোগী মরতেই পারে না। ওর নাড়ীতে আমি আয়ু পেয়েছি।

গোপাল রায় বললেন—তোমার মত আনাড়ী কবিরাজের কথা আর বিশ্বাস করি কি করে? বলেছিলে তিন দিনের মধ্যে দাস্ত বন্ধ হ'য়ে হাকিমের স্ত্রী সুস্থ বোধ করবেন; কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমি খবর পেয়েছি, তাঁর তিরিশ চল্লিশের জায়গায় ষাট-সত্তর বার দাস্ত হচ্ছে এবং তা ডাহা রক্ত।

গুপীকবিরাজ বললেন—আজ রাত্রে আমি একথার কোনও উত্তর দিতে পারছিনি। কাল সকালে রোগিণীর অবস্থা দেখে বলবো—

—অর্থাৎ, কাল সকালের মধ্যেই যে সে ফরসা হয়ে যাবে এ ভরসা তুমি পেয়েছো। আমি তোমার মতলব বুঝিছি! যাক্, আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়গে। গামছাখানা মাথার শিয়রে নিয়ে শুয়ো। কখন যে ঘাটে যাবার ডাক পড়বে তার তো ঠিক নেই! কেন যে মরতে তোমায় সঙ্গে এনেছিলুম। হাকিমের ঘরের মড়া—ও বইতেই হবে! নিজেও ডুবলে, আমাকেও ডোবালে!···তোমার ঐ আয়ুর্বেদই যত নষ্টের মূল!

গুপীকবিরাজের মুখে কোনো কথা নেই। তিনি পাথরের মত স্থির নিশ্চল!

রায় বাহাদুর কবিরাজের এই বিমূঢ় ভাব দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন! যে দুর্দান্ত গুপীকবিরাজ আয়ুর্বেদের নিন্দা শুনলে একেবারে বারুদের মতো দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, কারুর খাতির রেখে কখনো কথা ক'ন না!—তাঁর আজ এ কি ভাব?

তিনি কবিরাজকে উত্তপ্ত করবার জন্য আর একবার সচেষ্ট হলেন। বললেন—কাল সকালেই তোমার ঐ আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ

সব আমি টান মেরে ফেলে দেবো নদীর জলে! নির্বেদ করে ছেড়ে দেবো তোমায়! তুমি নিজেও অথর্ব হ'য়ে পড়েছো; তোমার ওই দু'হাজার বছর আগেকার চরক-সুশ্রুতও অথর্ব হয়ে পড়েছে! কাজেই তোমার আয়ুর্বেদও হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এখন—'অথর্ববেদ!'—'নাগার্জুন' ফেলে দাও গে ডাষ্টবিনে। ও নাগের আর বিষ নেই, অর্জুনেরও গাণ্ডীব অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েছে!—

গুপীকবিরাজের তবু কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না! নিবাত-নিষ্কম্প নীরব! যেন ধ্যানসমাহিত যোগী।

রায়বাহাদুর গোপাল রায় বুঝলেন, হাকিমের স্ত্রীর অবস্থা তা'হলে যথার্থই গুরুতর!

তিন

সকালে উঠেই গুপীকবিরাজ হাকিমের বাড়ী ছুটলেন। রাত্রে আর কোনো দুঃসংবাদ আসেনি। সরাসরি রোগীর ঘরে ঢুকে দেখেন সেই আট নয় বছরের ছোট মেয়েটি কাছে বসে আছে। হাকিমের স্ত্রী মুহ্যমান অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। নাড়ী টীপে দেখে গুপীকবিরাজ যেন একটু আশান্বিত হ'লেন। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—খুকী! ইনি কি তোমার মা?

খুকী ঘাড় নেড়ে বললে—হাঁ; কিন্তু আমার নিজের মা নেই।

—ও! বুঝেছি। তোমাকে এঁরা পালন করছেন। আচ্ছা, খুকী তোমার মা কাল কি খেয়েছিলেন জানো?—

—কিচ্ছু খাননি! কাল মা'র বড্ড অসুখ বেড়েছিল। বাবা বললেন, আপনার ওষুধ খেয়েই এতটা বেড়ে গেল!

—ও! তাই বলেছেন বুঝি? আচ্ছা পরশু তোমার মা কি

খেয়েছিলেন ?

—কেন, মা যা খায় রোজ—জলবার্লি !

—ও ! আচ্ছা, তার আগের দিন কি খেয়েছিলেন ?

—ওই জলবার্লি। মা তো রোজ জলবার্লিই খায় !

—ও ! এর মধ্যে কি তোমার মা একদিনও ভাত খায়নি ?

—না !

—হালুয়া ?

—না !

—ছানা-চিনি ?

—না তো !

—গরম লুচি ?

—একদিনও খাননি !

—কেন খাননি ?

—ওরে বাবা ! আপনি যা-যা সব মা'কে খেতে বলে গেছলেন—বাবা কিচ্ছু খেতে দিলেন না। বললেন—কবিরাজ মশায়ের মাথা খারাপ ! ও সব খেতে দিলে সেই দিনই মা মরে যাবে !

—হুঁ ! বলে গুপীকবিরাজ উঠে দাঁড়ালেন। একবার জিজ্ঞাসা করলেন—আমার ওষুধও বোধ হয় তোমার বাবা ওঁকে খেতে দেননি ?

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ কবিরাজ মশাই, ওষুধ আপনার সবগুলোই বাবা নিজের হাতে রোজ ঘড়ি দেখে খাইয়ে দিয়েছেন মাকে !

—হুঁ ! ব'লে গুপীকবিরাজ রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে একেবারে হাকিম সাহেবের খাস্ কামরায় গিয়ে ঢুকলেন।

জেলার হাকিম মিঃ এম ঘোষ তখন স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ধনীজনে পরিবৃত হ'য়ে কি যেন একটা বিশেষ জরুরী বিষয় আলোচনা করছিলেন। বজ্রনাদে গুপীকবিরাজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আপনি না কি এ জেলার

হাকিম? ধর্মাধিকরণে বসে ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন? সত্য-মিথ্যার সাজা দেন?—কিন্তু, হাকিম যদি মিথ্যাচরণ করে তবে তার সাজা দেবে কে? আপনার মত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত যে ব্যক্তি বিচারকের দায়িত্ব সত্ত্বেও হীন মিথ্যাচরণ করে—তাকে কোন্ শাস্তি দেওয়া উচিত? আপনি পত্নীঘাতক! যদি বিচারকের অভিমান মনের মধ্যে থাকে তবে বিচার করুন, আপনার বিরুদ্ধে আমি চিকিৎসকের সঙ্গে প্রতারণা ও মিথ্যাচরণপূর্বক পত্নীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করে তোলার অভিযোগ করে গেলুম—বলে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কোনোদিকে দৃকপাত না ক'রে গুপীকবিরাজ চলে এলেন।

* * * * *

রায় বাহাদুর গুপীকবিরাজকে এত শীঘ্র ফিরে আসতে দেখে বললেন—কী হে ধন্বন্তরী, হাকিমানীর সংবাদ কি? ইহলোকে আছেন? না পরলোকে যাত্রা করেছেন?—

গুপীকবিরাজ তখন সমস্ত ব্যাপার গোপাল রায়কে বুঝিয়ে বললেন। বললেন—যে ঔষধ আমি দিয়েছিলুম, পাথর খেলে হজম হ'য়ে যাবে, এমনিই প্রবল তার জারক শক্তি! কিন্তু ওই নির্বোধ মূর্খ অর্বাচীন হাকিম রোগীকে ঔষধ ঠিক খাইয়েছে, অথচ পথ্যের বেলা নিজের মোটাবুদ্ধি খাটিয়ে স্ত্রীলোকটাকে মেরে ফেলতে বসেছে! এখনও আমি মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারি; কিন্তু, ওরূপ কপট মিথ্যাবাদীর বাড়ী আমি আর ঢুকবোনা! ওটা পত্নীঘাতী—পাপিষ্ঠ!

এমন সময় ভোঁ ভোঁ করে বাইরে মোটর-হর্ণের আওয়াজ হ'ল। হাকিম সাহেব সদলবলে এসে হাজির! শশব্যস্তে গোপাল রায় ছুটে গেলেন—ব্যাপার কি?

মহাক্রুদ্ধ হাকিম সাহেব রক্তচক্ষু পাকিয়ে বললেন—কোথাকার এক পাগলকে আপনি আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন? স্ত্রীকে

তো মারতে বসেছেই আবার আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে এসেছে —পাঁচজন লোকের সামনে। আমি ওকে জেলে দেবো—

গুপীকবিরাজ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—তার আগে তোমার মতো নচ্ছার হাকিমের ফাঁসি হওয়া উচিত। ঔষধ দিয়েছো, কিন্তু পথ্য না দিয়ে পত্নীকে মারতে বসেছো!...চিকিৎসকের কথা মান্য করেছ কি মূর্খ? আবার একটা বিবাহ করবার সাধ হয়েছে বোধ করি! মিথ্যাবাদী—কপটচারী—

—দেখুন মশায়! শুনুন একবার! কথাবার্তা শুনুন!

অতিকষ্টে উভয় পক্ষকে ঠাণ্ডা করে রায় বাহাদুর গোপাল রায় বিনীত নিবেদন করে হাকিম সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অন্যায়টা হাকিম সাহেবই করেছেন অতি মারাত্মক রমক! রোগীকে চিকিৎসকের নির্দেশ মত পথ্য না দেওয়াটা তাঁর অত্যন্ত নির্বোধের ন্যায় কাজ হয়েছে!

হাকিম সাহেব বললেন—যার সামান্য একটু বুদ্ধি বিবেচনা আছে, সে লোক কখনও অমন রোগীকে—যার পেটে জল-বার্লিটুকুও তলাচ্ছেনা, দিনে পঞ্চাশ ষাট বার যার দাস্ত হ'চ্ছে—তাকে হালুয়া, লুচি, ছানার কালিয়া আর পোলাও খেতে দিতে পারে! দিলে তো রেগুলার মার্ডার করা হবে!

রায় বাহাদুর বললেন—বেশ কথা, তাহলে আপনার পক্ষে ওঁর দেওয়া ঔষধও খাওয়ানো উচিত ছিল না। ওঁর সমস্ত কথা মেনে চলবেন বলে ওঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়াটাও উচিত হয় নি।...তারপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন ঔষধের গুণাগুণ!

হাকিম সাহেব অপ্রতিভ হয়ে বললেন—বেশ, উনি আমাকে কাগজে-কলমে গ্যারাণ্টি লিখে দিন যে ঐরূপ পথ্য দেওয়ার ফলে রোগীণীর যদি অনিষ্ট হয় তাহ'লে উনি হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে প্রস্তুত আছেন!

—ছমাস কেন? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যদি রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহলে শুধোও রায় বাহাদুর ওই মূর্খ হাকিমটারে, ও কি গ্যারাণ্টো লিখে দেবে আমায়? ব'লে গুপী কবিরাজ সদম্ভে হাকিমের দিকে তাকালেন।

হাকিম বললেন—দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবো আমি—

গর্জন করে উঠে গুপীকবিরাজ বললেন—পুরস্কার এক কপর্দকও আমি তোমার মত অর্বাচীনের কাছে গ্রহণ করবো না। দু'হাজার টাকা আক্কেলসেলামী দেবে বলে লিখে দাও! হাকিম হয়ে মিথ্যাচরণ করার দণ্ড দেবে বলে লিখে দাও!—"

* * *

বিবাদ মিটে গেল! চিকিৎসা চলতে লাগলো। গুপীকবিরাজ নিজের হাতে ঔষধ প্রস্তুত করে রোগিণীকে সেবন করান। স্বয়ং উপস্থিত থেকে রোগিণীর পথ্যাদির তদারক করেন।

সপ্তাহকালের মধ্যেই হাকিমের স্ত্রী মেঝের বিছানা তুলে দিয়ে খাটে গিয়ে শুলেন। গুপী কবিরাজ এসে তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—আজ কেমন আছিস মা?

—খুব ভাল আছি বাবা! আপনার দয়ায় আমি ভাল হ'য়ে গেছি!

—ক্ষুধা কেমন বেটি?

—বড্ড ক্ষিদে বাবা! যা খেতে দিচ্ছেন তাতে আমার পেট ভরে না!

গুপী কবিরাজের মুখে হাসি দেখা দিলে। আচ্ছা—আচ্ছা মা, আর সাতদিন যাক্। তোকে সব খেতে দেবো!

* * *

মাসখানেক পরের কথা। রায় বাহাদুর গোপাল রায় বাড়ী ফিরবেন। গুপীকবিরাজও তল্পীতল্পা বাঁধছেন।

সস্ত্রীক হাকিম সাহেব এলেন তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে।

হাকিমের স্ত্রীর পূর্বস্বাস্থ্য প্রায় ফিরে এসেছে। মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাঁর রোগপাণ্ডুর তনুর তরুণ-শ্রী আবার নবসৌন্দর্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। গুপীকবিরাজকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই, কবিরাজ বললেন—আমার প্রণামী কই ?

—এনেছি দেবতা ! বলে হাকিম সাহেব তাঁর হাতে একখানি পাঁচশ' টাকার চেক দিলেন। গুপীকবিরাজ বললেন—আর দেড় হাজার কি বাকি থাকলো ?

হাকিম সাহেব বললেন—আপনার ঋণ ত শোধ হবার নয়। আপনার কৃপায় আমার স্ত্রীর পুনর্জন্ম হয়েছে !—

রায় বাহাদুর কবিরাজকে বললেন—ওই ঢের হয়েছে বাবা, নাওনা ! দিয়েছো তো সেই ইষ্টকাদি বটিকা, আর বৃহৎ অট্টালিকাচূর্ণ ! পঞ্চাশ টাকাও লাগেনি ! পাচ্ছ পাচশো !

গুপীকবিরাজ গম্ভীরভাবে বললেন—এই পাপেই আয়ুর্বেদ আজ ধ্বংস হতে চলেছে !

স্টিমার পার্টি

এক

শোভা জিজ্ঞাসা করলে—কাল স্টিমার পার্টিতে যাচ্ছত ?

বললুম—হ্যাঁ, যখন আমি না গেলে তুমি যাবেনা বলছ তখন না গিয়ে উপায় কি ?

—তোমার নিজের কি একটুও যাবার ইচ্ছে নেই ?

—যদি রাগ না করো তো বলি—এ দলের সঙ্গে নিশ্চয়ই নেই।

—কেন ? এ দলের অপরাধ কি শুনি ?

—অপরাধ কি জানিনি, তবে তোমাদের দলটি যে বিশেষ সুবিধের হবে না এটা বেশ বুঝতে পারছি।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ "বার্ডস অফ্ দি সেম্ ফেদার্" নয়। এর মধ্যে তোমাদের ভবানী মহিলা বিদ্যাপীঠের ছাত্রীরা আছে, আমাদের 'নালন্দা শিক্ষালয়ের' ছাত্ররা আছে, জনকতক অধ্যাপক ও শিক্ষয়িত্রীরাও যাচ্ছেন। তাছাড়া—তাছাড়া সস্ত্রীক ডাক্তাররা আছেন, ব্যারিস্টাররা আছেন, এটর্ণীরা আছেন, উকীলরা আছেন, হোমরা চোমরা সরকারী চাকুরেরাও আছেন। তার উপর আবার শুনছি কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বক্তারাও কেউ কেউ আসছেন।

—সেই ত বেশ ভাল! কেমন সবরকমের লোক একত্র এক জায়গায় জড় হয়ে একটা দিন জলের উপর আমোদে কাটিয়ে আসবে—"কসমোপলিটান গ্যাদারিং" কি তুমি পছন্দ কর না ? ওরা ছাড়া তো আরও অনেকে আসছেন শোননি ? বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টর, কনসাল্টিং

ইঞ্জিনীয়ার, পাটের দালাল, শেয়ার ব্রোকার, লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট—

—গুড লর্ড! একে তুমি "কসমোপলিটান গ্যাদারিং" বলো? এত' দেখছি দস্তুরমত একটা "হেটারোজেনাস্ ক্রাউড"! পনেরো থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সের নানা রকম মন, মেজাজ ও মতের লোকের এই যে এক সঙ্গে সমাবেশ ঘটাচ্ছ—এ অপূর্ব যোগাযোগ কতক্ষণ ভাল লাগবে— আর এর শেষ পরিণামই বা কি দাঁড়াবে—সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

—ভয় নেই, আমরা যখন সঙ্গে যাচ্ছি একটা প্রলয় কাণ্ড কিছু ঘটতে দেব না।

আমি হেসে বললাম—"প্রলয় কাণ্ড" না হলেও "লঙ্কা কাণ্ড" যে ঘটতে পারে এ সম্ভাবনা পুরাপুরিই রইল।

দুই

বেলা দশটায় স্টিমার একেবারে পাংচুয়ালি ছাড়বে শোনা গেছল। "কার্ডে"ও তাই লেখা রয়েছে দেখলুম। সংবাদপত্রে ঘোষণাও বেরিয়েছে সেই রকম।

অগত্যা শোভা রাত থাকতে আমায় তুলে দিয়ে বললে—শেভ্ করে মুখ হাত ধুয়ে নাও, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্চি। দশটায় স্টিমার ছাড়বে, তার মধ্যে স্নান করে দুটি ভাত মুখে দিয়ে বেরুতে হবে।

আমি বললুম—রক্ষে করো শোভা, সে আমি পারবো না। আমার কোনো পুরুষেই বেলা ন'টার সময় ভাত খাওয়া অভ্যেস নেই।

শোভা বললে—স্টিমারে খেতে বেলা হবে যে! হয়ত' দুটো তিনটে বেজে যাবে। পিত্তি পড়তে পারে—

বাধা দিয়ে বললুম—দেখ, একত' আজ রাত থাকতেই কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে আমায় তুললে। যে মানুষ বেলা আটটার আগে জীবনে কোন দিন বিছানা ছেড়ে ওঠেনি তাকে দিয়ে এই অসাধ্য সাধন করালে। এর উপর যদি নটায় ভাত খেতে বসাও—সইবে না! হঠাৎ একটা শক্ত ব্যায়রামে পড়ে যাবো। বরং, আমি বলি কি—স্নানটা সেরে নিয়ে মোটা রকম কিছু জলযোগ করে বেরুনো যাক্—কি বলো?—

শোভা আর দ্বিরুক্তি না করে বললে—কি খাবে চট্ করে বলো?

—এই ধরো—খান কতক গরম খাস্তার লুচি, একটু হালুয়া—গোটা দুই সন্দেশ—

শোভা রান্নাঘরের দিকে চললো—যাবার সময় বলে গেল—চা খেয়েই স্নানের জন্য তৈরী হও। আজ আর যেন খবরের কাগজ নিয়ে বোসনা! তাহলে বেলা হয়ে যাবে।

—যো হুকুম! ব'লে দাড়ি কামতে বসলুম। সরঞ্জাম আগেই তিনি গুছিয়ে শেভিং স্ট্যাণ্ডের উপর সাজিয়ে রেখে গেছলেন।

তিন

তৈরি হয়ে আমরা যখন বেরুলাম, দশটা বাজতে তখন মাত্র কুড়ি মিনিট!

লছমন একখানা ফিটন ডেকে এনেছিল। আমি বললুম—শোভা, স্টিমার যদি ধরতে চাও ট্যাক্সী নাও। ফিটনে গেলে পৌছতে এগারটা বাজবে।

শোভা বেশ একটু রাগ করেই বললে—তোমার জন্যইত এটা হল। অত করে বারণ করলুম—আজ আর খবরের কাগজ নিয়ে বোসনা—সেকথা কানেই তুললে না! তোমার মতলবই ছিল গোড়া থেকে

যাতে না যাওয়া হয়—

শোভারাণীর ক্রোধের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললুম—ট্যাক্সীতে গেলে ঠিক সময়েই পৌঁছতে পারবো—তুমি কেন বিচলিত হচ্ছ—

শোভা ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো—ট্যাক্সীর ভাড়া দেবে কে শুনি? একত' স্টিমার-পার্টির চাঁদা দিতেই আমাদের দু'জনের পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেছে! তার উপর আবার ট্যাক্সীভাড়া আড়াই টাকা আমি আর দিতে পারবো না! এখন মাসের শেষ উইক।—ক্যাস-মিটারে কম্পাসের কাঁটাটা প্রায় "জিরো" পয়েণ্টের দিকে ঝুঁকে পড়েচে।

হাত জোড় করে বললুম—আমি দেব'। চলো। তোমাকে ট্যাক্সী ভাড়ার জন্য ভাবতে হবে না।

তবু প্রশ্ন হল—কোথেকে দেবে শুনি? তোমার কি আলাদা একটা "ক্যাশ ডিপার্টমেণ্ট" আছে না কি?—

আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলুম। আম্‌তা আম্‌তা করে বললুম—না না, তা কেন? তুমি চলোনা—ট্যাক্সীতেই চলনা—আমার কাছে গোটা চারেক টাকা আছে। সেই যে "নিখিল বঙ্গ উৎপাত মঙ্গল সমিতি" বলে একটা কার্টুন এঁকেছিলুম—"আনন্দউৎসব পত্রিকা" সেটা তাদের অর্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণের জন্য কিনে নিয়েছিল। তুমি তখন কলকাতায় ছিলে না। টাকাটা আমার কাছেই পড়েছিল। মাঝে মাঝে নেহাৎ প্রয়োজনে দু'এক টাকা তাথেকে খরচ করেছি বটে, কিন্তু এখনও চার টাকা হাতে মজুদ আছে—

—মিথ্যে কথা।

শোভা গর্জে উঠলো—নিশ্চয় আমারই টাকা না বলে নিয়েছ তুমি? তাই বটে আমার হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছিনি এমাসে। ঠিক ঐ চারটে টাকারই তফাৎ হচ্ছে; দাও, ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দাও বলছি

এখনি—

প্রতিবাদ করা বৃথা জেনে টাকা চারটি সুড় সুড় করে শোভার হাতে বার করে দিয়ে ট্যাক্সীতে গিয়ে উঠলুম। ফিটনওয়ালা এজন্যে দু'আনা জরিমানা নিলে।

চার

আমরা যখন ডালহাউসি স্কোয়ারের পাশ দিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডে গিয়ে পৌঁছলুম একটা কোন্ গির্জে না অফিসের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল!

শোভাত অস্থির হয়ে উঠলো!—যাঃ! স্টিমার বোধ হয় আর ধরা গেল না!—

বললুম—নাই বা ধরা গেল? দিব্যি গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী ফিরে আসবো!

শোভা রীতিমত কাতর হয়ে পড়লো! বলতে লাগলো—দু'টো একটা টাকা নয়—এক মুঠো টাকা একেবারে বাজে বরবাদ হয়ে গেল! শোভা 'হায় হায়' করতে লাগল।

এই সময় ট্যাক্সী ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে—কোন ঘাটে গাড়ী লাগাবো হুজুর?

তাড়াতাড়ি বললুম—স্টিমার ঘাটে—জলদি লে চলো।

নিয়ে এলো সে চক্ষের নিমিষে! দূর থেকেই দেখতে পেলুম—ঘাটে স্টিমার দাঁড়িয়ে রয়েছে,—ফুল স্টিমে ধোঁয়া ছাড়ছে, এখনি বোধ হয় স্টার্ট করবে—

ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ছুটলুম প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে শোভার হাত ধ'রে গ্যাংওয়ে দিয়ে,—তখন স্টিমারের ভোঁ বাজতে সুরু হয়েছে।

দোতালায় উঠে ফার্স্ট ক্লাসের একটা বেঞ্চের উপর বসতে না বসতে স্টিমার ছুলে উঠলো। ঘড় ঘড় করে ইঞ্জিনের আওয়াজ সুরু হ'ল। দড়িদড়া তুলে ফেলার শব্দ পেলুম। স্টিমার ছেড়ে দিলে। বাহাদুরী করে বললুম বড্ড সময়ে এসে স্টিমারটা ধরা গেছে শোভন! কি বলো? আর এক মিনিট দেরী হলে কিন্তু পেতুম না!

শোভা বললে—মশাই যদি দয়া করে খবরের কাগজটা আজ পড়তে না বসতেন তা'হলে আর এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'তনা! সকাল সকাল এসে ধীরে সুস্থে স্টিমার ধরতুম। এমন ছুটোছুটি করতে হ'তনা!

শোভাকে খুশী করবার জন্য বললুম—মন্দ কি? এই হুটোপাটি হুড়োমুড়ি অনেকদিন পরে আজ আমার বেশ ভালই লাগলো!...... একটা পান দাও তো খাই!......গলাটা বড শুকিয়ে গেছে—এক গ্লাস জল পেলে ভাল' হ'ত। স্টিমারে ডাব নেওয়া হবে বলেছিলে না?—

হঠাৎ শোভা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো—এই গো! সর্বনাশ হয়েছে। ট্যাক্সী থেকে সুটকেশটা নামাওনি?—হায়, হায়, হায়! তোমার পানের ডিবে, সিগারেট কেস, আমার গরম স্কার্ফ, তোমার রামপুরী আলোয়ান, হাতমুখ মোছবার নতুন টাওয়েল দুখানা, আয়না, চিরুনী, ব্রাশ, একশিশি নতুন "লাবণি ক্রীম্" ভরতি একেবারে!—সবে কাল কিনে আনিয়েছি—যাঃ! সব গেল!

তাড়াতাড়ি বললুম—না না, যাবে কেন? ট্যাক্সীর নম্বরটা কি বলোনা, আমি এখনি ফোন করে দিচ্ছি! তোমার মনে আছে কি? দেখে রেখেছিলে নম্বরটা?

কথাটা বলেই মনে হ'ল—এটা বে-ফাঁস বলে ফেলেছি! ভাগ্যে শোভা শুনতে পায়নি। শোভার আক্ষেপ তখনও চলছে—হায় হায় হায়! বিকেলে স্টিমারে কাপড় বদলাবো বলে আমার সেই দামী জয়পুরী প্রিণ্ট সিল্কের সাড়ীখানা, ব্রোকেড ব্লাউসটা, সুইস এমব্রয়ডারী

করা নতুন পেটিকোট সব ছিল যে তার ভিতর, যাঃ! সমস্তই গেল!···
কেন যে মরতে তোমার কথা শুনে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছিলুম বাক্সটা। পাশে গদির উপর ছিল—বেশ ছিল। নামবার সময় হাতে ঠেকত। ঠিক নজরে পড়তো! আর, তুমিই বা কি রকম লোক বলোত? ট্যাক্সীর ভাড়া চুকিয়ে দিলে যখন একবার দেখলে না গাড়ীতে কিছু পড়ে রইল কি না?

আবার প্রমাদ গুণলুম। এ দোষের জন্য আমি যে নিশ্চয়ই অপরাধী এ অস্বীকার করা চলে না। তোষামোদই এখানে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ভেবে বললুম—তোমায় গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়েই আমার মনে হ'ল আমার সব কিছুই নামানো হয়েছে, গাড়ীতে আর কিচ্ছু নেই। তুচ্ছ সুটকেসের কথা কি আর মনে থাকে?

ফল কিন্তু বিপরীত হল।

শোভা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলে' বললে যে—ঢের ঢের নির্লজ্জ মানুষ সে দেখেছে, কিন্তু আমার নাকি জুড়ি নেই—!

এই সময় ঢং ঢং ঢং ঢং করে স্টিমারে ঘণ্টা বেজে উঠলো—চেয়ে দেখি স্টিমারের গতি মন্থর হয়ে এসেছে এবং স্টিমারখানি আস্তে আস্তে ওপারে হাওড়া স্টেশনের দিকে গিয়ে লাগছে।

মনে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া এসে পড়লো। ভুল ক'রে আমরা ফেরি জাহাজে উঠে পড়িনি ত? সংশয়াকুল দৃষ্টি মেলে দক্ষিণে চেয়ে দেখে মনে হ'ল হাওড়ার পুলটা যেন খানিকটা খোলা হয়েছে!—ঠিক বুঝতে পারলুম না।

পাঁচ

এই সময় জনকতক সাহেব মেমের দিকে দৃষ্টি পড়ায় শোভা চঞ্চল হ'য়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—হঁ্যাগা! ওরা এ জাহাজে কেন?—আমাদের

'স্টিমার পার্টিতে' কোনও সাহেব মেমের যাবার কথা শুনিনি ত ?—

এর কি জবাব দেওয়া যেতে পারে ভেবে আমি তখন ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছি—

শোভা হঠাৎ চমকে উঠে বল্‌লে—হঁ্যাগা! অত মাড়োয়ারী আমাদের স্টিমারে উঠেছে কেন? ওমা! কুলী মজুরও যে দেখছি; একটা চেনা মুখত এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না? সুনন্দা, গায়ত্রী, পম্পা, রেবা কাউকেই দেখছিনি ত! তারা ত' চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়!

অস্ফুটকণ্ঠে বললুম—হঁ্যা, তা ত' নয়ই!

শোভা আবার চম্‌কে উঠলো।—ওমা! এযে চীনেম্যান একদল গো! ওরা আবার ওখানে কারা? মাদ্রাজী না মারাঠীর মতন মনে হচ্ছে?

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—না, ওরা গুজরাটি।

শোভা বললে—মহিলা সমিতির ওরা দেখছি পাগল। 'কসমো-পোলিট্যান গাদারিংটা' সব রকমে সাকসেস্‌ফুল করবার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মেয়েপুরুষদের এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছে? ধন্য ওদের উৎসাহ!

একটা শুধু অব্যক্ত আওয়াজ মুখ থেকে বেরুলো! বোধ হয় বললুম— "হুঁ"! বুকের ভিতর কিন্তু তখন গুর্ গুর্ করছে। শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করছি।

শোভা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—মহিলা বিদ্যাপীঠের কাউকেইত' দেখছিনি? হঁ্যাগা, তোমার চেনা কাউকে দেখতে পেলে কি স্টিমারে?

শুষ্ককণ্ঠে বললুম—না! কাউকেই দেখছিনি। এমন সময় আমার নাম ধরে কে একজন বলে উঠল—আরে—এই যে! তুমিও বুঝি ব্রীজ খুলে দেবার আগে এসে জুটতে পারনি? বেশ! বেশ। সাধে কি আর তোমার নাম দিয়েছিলুম আমরা 'এথেলরেড দি আনরেডি!' যাই বলো দাদা, এই লটবহর নিয়ে স্টিমারে গঙ্গা পেরুনো—এ এক ঝকমারি!...

তার উপর তোমার সঙ্গে ত আবার জীবন্ত লগেজ-স্বরূপিণী আমাদের শ্রীমতী বৌদি ঠাকুরাণি রয়েছেন দেখছি। কিছু মনে করবেন না বৌদি। এই আপনাদের জন্যই শাস্ত্রকারেরা লিখে গেছেন—'পথে নারী বিবর্জিতা।' নিন, উঠে পড়ুন—আর কেন? এইবার নামতে হবে যে! ওপারে জাহাজ লেগেছে—

একে আমার অবস্থা তখন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। তার উপর আবার এই এক অসভ্য আলাপীর এ হেন গ্রাম্য রসিকতার ব্যাপারে আমি তো আর আমাতে নেই। চোরের মতো আড়চোখে শোভার দিকে চাইতেই দেখি আমাকে সে ইঙ্গিতে কাছে ডাকছে। চোখেমুখে বিরক্তির ও ঘৃণার ভ্রূকুটি ফুটে ত উঠেছেই, তার সঙ্গে ফুটে উঠেছে একটা উৎকণ্ঠা।

কাছে যেতেই শোভা অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—এ লোকটা কে?

বললুম—আমাদেরই এক সহপ [illegible] বলে মনে হচ্ছে—নামটা ওর ভুলে গেছি, তবে ওকে আমরা ক্লাশ-শুদ্ধ ছেলে—'সলোমন দি স্লো' বলে ডাকতুম। সেটা বেশ মনে আছে।

শোভা বললে—উনি যে বলছেন—পোল খুলে দিয়েছে বলে স্টিমারে গঙ্গা পার হচ্ছেন। এটা কি তবে সেই 'ফেরি স্টিমারে' এসে উঠেছি আমরা?

কণ্ঠস্বর একেবারে নিম্নগ্রামে নামিয়ে নিয়ে এসে অতি মৃদুভাবে বললুম—সে রকমই যেন বোধ হচ্ছে!

শোভা বিস্ময়কাতর কণ্ঠে বলে উঠল—সেকিগো! বলো কি তুমি?

অধিকতর কাতর কণ্ঠে বললুম—খুব সম্ভব তাড়াতাড়িতে—সেই—সেই অবাঞ্ছিত ব্যাপারই ঘটে গেছে!

শোভা আর কিছু বললেনা দেখে দুশ্চিন্তায় কাতর হ'য়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে জানালুম—তাইত!—কি করা যায় বলত! বড্ডই ভুল হয়ে গেছে

দেখছি ! এখন উপায় !

আগন্তুক বন্ধুটির বোধ হয় আমার অবস্থা দেখে দয়া হ'ল। আমাকে প্রশ্ন করে 'স্টিমার পার্টির' সমস্ত বিবরণ শুনে বললেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ আজকের কাগজে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু সে স্টিমার ত ছাড়বে 'চাঁদপাল ঘাট' থেকে, এই দেখনা—" বলে তাঁর হাতের 'আনন্দবাজার' খানা আমাদের চোখের উপব মেলে ধরলেন—

দেখেত' আমার দু'চোখ ঝাপসা হ'য়ে এল। কাগজে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—

"বেলা দশ ঘটিকায় 'চাঁদপাল ঘাট' জেটি হইতে স্টিমার ছাড়িবে। টিকিটখানি সঙ্গে আনিবেন।"

পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলুম ১১টা বাজে ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো !

বন্ধু আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললেন—একটা কাজ করলে তোমরা এখনও স্টিমারখানা ধরতে পারবে—

আমি ও শোভা দুজনেই সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে চাইলুম।

বন্ধু বললেন—স্টিমার খানা প্রথমে 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে' গিয়ে লাগবে লিখেছে। সেখানে নেমে পার্টিরা আধঘণ্টা বিশ্রাম ও জলযোগ করে আবার যাত্রা করবে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে। সুতরাং তোমরা এপারে নেমেই একখানা ট্যাক্সী নিয়ে—কিম্বা বাসে উঠে বোটানিক্যাল গার্ডেনে চলে যাও ! সেখানে নিশ্চয় স্টিমার পাটির সঙ্গে দেখা হবে।

অকস্মাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ কাণে এলো ! চমকে পাশে চেয়ে দেখি—শোভার মুখের স্বাভাবিক বর্ণ কতকটা ফিরে এসেছে ! অধর-প্রান্তেও একটু যেন ক্ষীণ আশার হাস্যরেখা গোপনে উঁকি দিয়েছে !—

তখন আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম !

রাষ্ট্র-ভাষা

এক

প্রতিমা খুব রেগেই বাইরের ঘরে ঢুকে বললে—সকাল থেকেই লেখা নিয়ে বসলে—সংসারের কাজগুলো কি এ রবিবারেও হবেনা ?

বিভূতি একটু অপ্রতিভ হ'য়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে—লক্ষ্মীটি, এ রবিবারটা আমায় ছেড়ে দাও। আসছে রবিবারে তোমার সমস্ত কাজ আমি নিশ্চয় শেষ করে দেবো—

প্রতিমা একেবার জ্বলে উঠে বললে—প্রত্যেক সপ্তাহেই ত' শুনছি—এ রবিবার নয়, আসছে রবিবার—নিশ্চয় ! কিন্তু 'রবিবার' এলেই সে কথা আর মনে থাকে না ! একটা না একটা ওজোর তোমার লেগেই আছে ! আচ্ছা, আজকে পারবে কেন শুনি ?

—ভারতবর্ষের 'রাষ্ট্র-ভাষা' হিন্দি করা হ'বে বলে কংগ্রেস থেকে যে প্রস্তাব হয়েছে, আমাদের সাহিত্যসভা থেকে আজ তার প্রতিবাদ করা হবে। আমার উপরই ভার পড়েছে যুক্তি দিয়ে দেখাবার যে, ভারতবর্ষের 'রাষ্ট্রভাষা' হবার যোগ্যতা সকলদিক থেকে দাবী করতে পারে একমাত্র বাংলা ভাষা।

—ও নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

—নেই ? বলো কি ! হিন্দি 'রাষ্ট্রভাষা' হলে যে আমাদের বাংলাভাষা আর বাংলা-সাহিত্য একেবার ডুবে যাবে।

—কেন ? আজ তো প্রায় দেড়শো বছরের উপর ইংরিজি এ দেশের 'রাষ্ট্রভাষা' হয়ে রয়েছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কি সে জন্য অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে ?—

—আহা, তুমি কথাটা ঠিক বুঝচো না। ইংরিজি ত' আর এদেশের ভাষা নয়, তাই আমাদের ভাষাকে গ্রাস করতে পারেনি, কিন্তু 'হিন্দি' 'রাষ্ট্রভাষা' হ'লে কি আর রক্ষে আছে ? সমস্ত ভারতবর্ষে 'হিন্দিভাষা'ই প্রধান হয়ে উঠবে। অতঃপর সমস্ত বইই তো হিন্দিভাষাতেই রচিত হবে। কারণ, সারা ভারতবর্ষে তা' বিক্রী করবার সুবিধা পাওয়া যাবে।

—সে তো ভালই হবে। এখন তোমাদের একখানি বই এক-হাজার কাটতে তিনবচ্ছর লাগে, তখন বছর বছর এডিশন হবে। দু'পয়সা ঘরে আসবে।

—সর্বনাশ। তুমি কি বলতে চাও আমরা কিছু অর্থাগমের প্রলোভনে 'বঙ্গবাণী'র সেবা ছেড়ে হিন্দি বাগ্দেবীর অর্চনা করবো—সে কিছুতেই হবে না—"জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে! চাহিনা অর্থ—চাহিনা মান!"

প্রতিমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—থামো! তোমাদের এই গ্যাকামী আর আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যেই তোমরা মারা যাবে। 'বঙ্গভাষা'র চেয়েও ঢের বেশী করেই চাও তোমরা—অর্থ আর মান।

—সেত' দুনিয়ায় সবাই চায় দেবী, তা বলে বাঙালী হয়ে বাংলা-ভাষায় দাবী ছেড়ে হিন্দি বুলি ধরবো ?

—হিন্দি বুলি ত' সারাদিনে তোমাদের মুখে বারো-আনা রকম শুনি, না হয় এরপর বাকী চারআনাও শোনা যাবে তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাটাই ত' বেশী দেখছি!

—দেখ, সব কিছু টাকা-আনা-পাই দিয়ে মাপলে চলে না, জাতীয়তাবোধ বলেও একটা জিনিস আছে—

বাধা দিয়ে প্রতিমা বললে—তা হলে তোমরা 'ভারতীয়' হ'তে চাও না ? 'বাঙালীই' থাক্‌তে চাও ? কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তির চেয়ে সেন্টিমেণ্টটাই তোমাদের প্রধান অবলম্বন দেখছি!

বিভূতি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—বাঃ, যুক্তি নেই!

সেন্টিমেন্টের দোহাই পড়লে অন্য প্রভিন্সের লোকেরা তা মানবে কেন? 'রাষ্ট্রভাষা'র অধিকার দাবী করার স্বপক্ষে বাংলা ভাষার একাধিক প্রবল যুক্তি রয়েছে। ধর না কেন—প্রথমতঃ ভারতবর্ষের আর কোনো ভাষাই এত উন্নত ও প্রগতিশীল নয়; রবীন্দ্রনাথের মতো কবি—শরৎচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক যে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন—

—থামো, তোমাদের ব্যাঙের আধুলির অহঙ্কার আর সহ্য হয় না। এঁদের কারুর কোনো বই আজ পর্য্যন্ত দু' চার লাখ ত' দূরের কথা, বিশ পঁচিশ হাজারও কি—বিক্রী হয়েছে বলতে পারো? তুমি নিজে কখনো একখানা কিনে পড়েছো?

—বই বিক্রীর সংখ্যা না বাড়ুক, বাংলা সংবাদপত্র ত' পঞ্চান্ন হাজারের ওপোর কাটছে রোজ। ভারতবর্ষের আর কোনো ভাষার কাগজই এ গৌরব দাবী করতে পারে না।

নেপালী আয়া বাড়ীর ভিতর থেকে একটি রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে নিয়ে এসে বললে—মায়িজী! বাচ্চী রোতি, দুধ পিলানেকা টাইম হুয়া—

—চলো, হাম আতা হ্যায়! বলে প্রতিমা স্বামীকে বললেন—'রাষ্ট্রভাষা' বাংলা হোক বলে তোমরা যতই চেঁচাও, হিন্দি তোমাদের অন্দরে হানা দিয়েছে। তাকে তাড়ানো শক্ত—

পাঁড়ে ঠাকুর এসে বললে—মায়িজী! চুলাকা চিম্‌নি বিগড়্ গিয়া!

—ছট্টু বেহারাকো বোলো অভি যাকে মিস্ত্রীকো বোলায় লেয়ানে" বলে প্রতিমা বাড়ীর ভিতর যাচ্ছিল এমন সময় ছট্টু বেহারা এসে বললে—মায়িজী, ধোবী কাপড়া লে আয়া!

প্রতিমা বললে—বাবুকো পাশ উসকো পাকাড়কে লে আও। ছট্টু চলে গেল। প্রতিমা স্বামীকে বলে গেল—ওগো, ধোবাটাকে একটু বকে দাও। বড্ড দেরী করে কাপড় আনতে শুরু করেছে। গয়লাটাও

মুখে জল ঢালছে বেজায়। তাকেও একটু শাসন করা দরকার!

প্রতিমা বাড়ীর ভিতর যেতে না যেতেই বিভূতির বন্ধু বিজয় এসে হাজির হ'ল। বললে—ওহে! আজ ন'টার শোতে 'অচ্ছুত কন্যা' দেখতে যাবো। তোমাদেরও যেতে হবে। বুক্ করে এসেছি।

—ভাল করেছো। ছটা হ'লে যেতে পারতুম না। আমাদের 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রতিবাদ সভা আছে।

—আরে রেখে দাও তোমার রাষ্ট্রভাষা! বাংলা দেশে কোনো বাংলা ছবিও এত বেশী উইক চলেনি। "অচ্ছুত কন্যা"র বাহান্ন উইক আরম্ভ হয়েছে। হিন্দি ছবি বাংলা দেশে রেকর্ডব্রেক করলে।

ধোবাকে ধরে নিয়ে এল ছোট্টু বেয়ারা। বিভূতি বেহারাকে হুকুম করলে—এক ছিলিম তামাকু দেও। জল্‌দি 'চা' বানানে বোলো!

'বহুত আচ্ছা হুজুর!' বলে ছট্টু চলে গেল। বিভূতি ধোবাকে বললে—এতনা দের্‌সে তোম কাপড়া লেয়াগা তো হাম্ দুস্‌রা ধোবী বন্দবস্ত্ করেগা।

ধোবা করজোড়ে মিনতি করে জানালে—হোলীকো লগি ইস্‌বখত্ থোড়া দের্ হো গিয়া—আউর এ্যয়াসা নেহী হোগা।

বিজয় বললে—আমার টাইপ রাইটিং মেশিনটার দরকার হয়েছে, তোমার যদি কাজ হয়ে গিয়ে থাকে তো আমি নিয়ে যাই।

বিভূতি বললে—হ্যাঁ, নিয়ে যেতে পারো। আমার কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে? বেজায় ভারি যে!

—একটা ঝাঁকা মুটে ডেকে নিয়ে আসুক না।

ছট্টু তামাক নিয়ে আসতে বিভূতি বললে—একঠো মুটিয়া বোলাও! ছট্টু চলে যাচ্ছিল বিভূতি আবার তাকে ডেকে বললে—একঠো নৌয়া ভি বোলানা—চুল ছাঁটনে মাঙতা!

বিজয় বললে—হেয়ারকাটারের বাড়ী চুল ছেঁটে এলেই তো পারো।

এ বেটা হয়তো একটা হিন্দুস্থানী নৌয়া ধরে আনবে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মত চুল ছেঁটে দিয়ে যাবে।

বিভূতি হেসে বললে—তা দিলেই বা—চুলের ভার কমার সঙ্গে তাতে ব্যয়েরও কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। তোমার হেয়ার কাটার তো আট আনার কম কাঁচি ধরবে না।

মুটে এলো। শ্যামপুকুর যেতে হবে শুনে চার আনা চাইলে। বিজয় রুখে উঠে বললে—ভাগো! তোম চোট্টা হ্যায়! তোমকো হাম পুলিশমে দেগা!

মুটেও রুখে উঠে বললে—কাহে পুলিশমে দেগা? কেয়া চোরায়া হাম আপকো?

বিভূতি মধ্যস্থ হয়ে বললে—ওকে যেতে দাও—মুটের বদলে বরং একখানা রিক্‌শা গাড়ী নিয়ে আসুক; মেসিনটা নিয়ে তুমি তার উপর বসে যেতে পারবে। মুটের সঙ্গে আর হেঁটে যেতে হবে না।

বিজয় বললে—ঠিক বলেছো, সাহিত্যিক হলেও তোমার বুদ্ধি আছে। চার আনাই যদি দিতে হয়—মুটে কেন? রিক্‌শাই ভালো।

ছটু ছুটে এসে বললে—হুজুর গোয়ালা আয়া।

বিভূতি গয়লাকে বললে—দুধমে এতনা পানি মিলাতা কাহে? হাম আউর তোমরা পাশ দুধ নেই লেগা।

গয়লা মস্ত সেলাম ঠুকে বললে—জনাব, যো পানি মিলায়তা উসকো জুতি মার্ না। কালী কশম্, হাম তন্নিসে পানি নেহি ডালতা!

রিক্‌শা ও নাপিত এসেছে শুনে বিজয় উঠে পড়ল। রিকশাওয়ালাকে বললে—শ্যামপোখর যানে হোগা। কেতনা লেগা?

রিকশাওয়ালা সবিনয়ে জানালে—হুজুর! জো মিলতা ওহি দেনা! হাম কেয়া বোলে? আপ লোকোন্‌কো তো সবই কুচ্ মালুম হ্যায়।

বিজয় চলে গেল। বিভূতি চুল ছাঁটতে গিয়ে দেখলে নাপিত

ছটুলালেরই স্বজাতি। বললে—বাংলা চুল বানানে শেকৃতা ?

হিন্দুস্থানী নাপিত বললে—জী হাঁ, বহুৎ ভারি ভারি বাবু লোকোনকো বাল বানাতা হাম্।

বিভূতি চুল ছাঁটতে বসে মনে মনে বললে—আমি 'ভারি' নই বাবা! পেটের দায়ে নেহাৎ হালকা!

দুই

চুল ছেঁটে স্নান করে ভাত খেয়ে এক ঘুম দিয়ে বিভূতি যখন উঠলো বেলা তিনটে বাজে। প্রতিমা বললে খুকুর জন্যে গোটাকতক আটপৌরে পেণী করবো। ছিটের কাপড় কিছু কিনতে হবে। এমনি ফেরিওয়ালা গুলো রোজ হেঁকে যায়, আজ কিন্তু এক ব্যাটারও দেখা নেই!

বিভূতি বললে—তারা বোধ হয় টের পেয়েছে যে আজ তোমার দরকার পড়েছে তাদের!

প্রতিমার দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—তার মানে ?

বিভূতি প্রমাদ গুণলে। তাড়াতাড়ি বললে—হয়ত আজও তারা 'কাপড় চাই' বলে হেঁকে গেছে, তোমার নজরে পড়েনি।

প্রতিমা বললে—আমি তো এখনো অন্ধ হইনি! খেয়ে উঠে পর্যন্ত এই বারান্দায় বসে আছি। পথের দিকে চোখ কান খাড়া রেখে রোদে পিঠটা দিয়ে চুলগুলো শুকিয়ে নিচ্ছিলুম—

পথ দিয়ে ফিরিওয়ালা হাঁকলে—'আইস্ ক্রীম'! এক আনা পাকিট! লে লিজিয়ে,—ঠাণ্ডা হায়', মিঠা হায়, সস্তা হায়!

আর একজন হেঁকে গেল—কমলা নেমু! বঁঢ়িয়া বঁঢ়িয়া মিঠা চিনি—টাট্‌কা ফল—একদম সর্বতিয়া!

আলমিনিয়াম বর্তন!—হাণ্ডি লেও, লোটা লেও—গিলাস লেও—চাঁদিসে ঝক্‌মক্‌!—হেঁকে গেল আর একজন

দো-দো-আনা, হরেক চিজ! দো-আনা—একখানা গাড়ীতে মনোহারী জিনিস সাজিয়ে আর এক ফিরিওয়ালা হেঁকে গেল।

চানাচুর! গরম! মশাল্লেদার!—আর একজন গেল।

ঠাকুর এসে বললে—মিস্ত্রী আয়া বাবুজী!

বিভূতি স্ত্রীকে বললে—ওই নাও—তোমার মিস্ত্রী এসেছে,—চিম্‌নির কি ব্যায়রাম হয়েছে বলোগে—

প্রতিমা রেগে উঠে বললে—ঢের ঢের কুঁড়ে দেখেছি। কিন্তু তুমি হলে একেবারে কুঁড়ের বাদশা! এইবার কোনদিন বলবে—ওগো! আজ আমার হয়ে তুমি অফিসটা করে এসো—

—তাহলে কিন্তু সাহেব খুসি হয়ে আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবে! বলে বিভূতি হেসে উঠলো!

—থাক, আর রসিকতায় কাজ নেই! লোকজনের সামনে। যাও, মিস্ত্রীটাকে নিয়ে চিমনি দেখিয়ে দাওগে। ঠাকুর! তুম্‌ ভি যাও বাবু কো সাথ্‌—

মিস্ত্রীকে চিমনি দেখাতে গিয়ে বিভূতি মুস্কিলে পড়লো। মিস্ত্রী বলে—ইস্‌মে তো কুচ্‌ ঘড়বড়্‌ নেই হুয়া বাবুজী! চিমনি তো ঠিকই হ্যায়!

বিভূতি বলে—তব্‌ ধোঁয়া কাহে নেই নিকাল্‌তা?

মিস্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বাজার চল্‌তি হিন্দিতে তর্ক বিতর্কের পর প্রমাণ হয়ে গেল যে, মেড়ুয়াবাদী পাঁড়েজী ঠাকুরের দোষেই ধোঁয়া বেরোয় না! চিমনি ঠিকই আছে—ঠাকুর ব্যবহার করতে জানে না।

তিন

সিনেমায় নিয়ে যাবে বলে বিজয় এসে দেখে বিভূতি তখনও সাহিত্য-সভা থেকে 'রাষ্ট্রভাষা'র বিবাদ চুকিয়ে ফেরেনি। এদিকে সময় হয়ে এলো—বিরক্ত হ'য়ে প্রতিমাকে বললে—দেখুন তো বৌদি ওদের পাগলামি!—বাংলা ভাষাকে করতে চায় ভারতের রাষ্ট্রভাষা! এমন মিষ্টি ভাষাটির দফা গয়া হবে তাহ্লে—

প্রতিমা কৃত্রিম বিস্ময়ের ভান করে বললে—কেন?

—কেন—আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি কি ইউ-পি, সি-পির কোন বন্ধুর মুখে 'বাংলা' বলবার অক্ষম চেষ্টা লক্ষ্য করেন নি?

প্রতিমা হেসে বলে—না। তবে, একবার কি যেন একটা উৎসবে কোথায় গিয়ে আমি এক বাঈজীর গান শুনেছিলুম। সে ত ঘণ্টা দু'য়েক ধোরে কেবলই 'সেঁইয়া বেঁইয়া' ক'রে কাটালে। মেয়েরা কিছু বুঝতে না পেরে বিরক্ত হ'য়ে উঠে যাচ্ছিল.দেখে বাঈজীকে অনুরোধ করা হ'ল একখানা 'বাংলা' গান গাইতে! বাঈজী তখন বাংলা গান ধরলে—সে শুনে আমরা আর হেসে বাঁচিনে!—

বিজয় কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি গান গাইলে?—

নিধুবাবুর একখানা টপ্পা!—গানটার দুলাইন আমার আজও মনে আছে—বাঈজী গেয়েছিল এইভাবে—

"Valo বাseeবে বোলিয়ে Valo বাseeনে,
হামারো sawভাবো say যে—টু-মা বোই আউর জানিনে!"

বিজয় হো হো ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়লো!

এমন সময় বিভূতি এসে হাজির। বললে—sorry; বড্ড দেরী হ'য়ে গেল! সভায় একদল দেশদ্রোহী বলে কিনা বাংলাকে 'রাষ্ট্রভাষা'

করে কাজ নেই! তাদের একঘেয়ে তর্কের জন্যেই ত এতটা সময় লাগলো!—

রিস্টওয়াচটায় একবার চোখ বুলিয়ে বললে—এখনো সময় আছে। ছট্টু যাক্ একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনুক! এই যে! প্রতিমার কাপড় পরা হ'য়ে গেছে দেখছি! তবে আর ভাবনা নেই! ওই কাপড় পরার ঠেলায় আমায় কতবার যে ট্রেণ মিস ক'রতে হয়েছে।—

প্রতিমা বললে—রাষ্ট্রভাষার জন্যে তুমি এইবার 'ব্রেণ' মিস করবে দেখছি!—

—আরে! ওদের কথা একবার শুনেছো? বলে কিনা—হাওড়া স্টেশন থেকেই তো 'হিন্দি' সুরু করতে হয়—এ কুলি, ইধার আও, মাল উঠাও—পাঁচলম্বর পিলাট ফার্ম মে লে চলো—সাড়ে ন'ও বাজেকা এক্‌স্‌প্রীস মে যানা, দেঢ়া মাশুল কা গাড়ী মে উঠাও—

বিজয় বললে—তারপর সারা পথই হাঁকাহাঁকি—পাণিপাঁড়ে—হালুয়াপুরী—চা-গরম—! হিন্দির নাগপাশে বন্দী হ'য়ে পড়েছি আমরা!—

ছট্টুলাল ট্যাকসি এনে হাজির করলে। বিভূতি বললে—চলো, আর দেরী নয়। এখনও গেলে আসল ছবিখানা শুরু থেকে দেখতে পাবো—গোড়ায় তো দেয় কতকগুলো রেডিয়ো নিউজ—বাজে!—

সবাই নীচেয় নেমে এলো। বিজয় ট্যাকসি ড্রাইভারকে বলে দিলে—চলো চৌরঙ্গী—যাঁহা ধরমতলাকা মোড়—হুয়া যো নয়া 'ছবিঘর' বনা হুয়া—জানতা—?

"—জী হুজুর! জানতা।" বলে শিখ ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে দিলে।—

বিভূতি বললে—কেৎনা লেগা বোলো।

ড্রাইভার সেলাম করে জানালো—যো মিটারমে আয়েগা হুজুর!

—নেই—নেই! উয়ো ঠিক নেই! রূপেয়ামে চার আনা বাদ দেগা—চলো!

শেষ দু'আনা বাদ রফা করে তাঁরা রওনা হ'লেন।

সিনেমার সামনে জনারণ্যে পৌঁছে—সবুর! সবুর!" ক'রে গাড়ী থেকে নেমে ওদের নামিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গিয়ে—বিভূতি দেখে ভীড়ের মধ্যে সেই মুহূর্তে কে তার পকেট মেরে নিয়েছে! একটু আগেও তার বুক পকেটে মণিব্যাগটা ছিল—বিভূতি হাঁকলো—পাহারাওয়ালা! পাক্‌ড়ো!

একটা লুঙ্গি পরা—গেঞ্জী গায়ে ছোক্‌রাকে পাশ থেকে সরে যেতে দেখে বিভূতি তাকে ধ'রে ফেলেছিল। সে ছোকরা তখন চোখ রাঙিয়ে বলছে—হাত পাকড়া কাহে?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করলে—তোম কোন হ্যায়?

"—তেরা বাপ হায় শালা—ছোড়্ হাত—" বলে এক ঝাঁকুনী দিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নিলে। বিভূতি আর একবার সকাতরে চীৎকার করলে—পাহারাওয়ালা—পাক্‌ড়ো। সেই সময় গোটাদুই ভিখিরি এসে বিভূতিকে বিরক্ত শুরু করলে—

—ভরদিন ভুঁখা হ্যায়—থোড়া কুছ মিলে—ভাগ্‌ওয়ান ভালা রাখে—বাল-বাচ্চা জিতা রহে বাবা!

ট্যাক্‌সিওয়ালা তাড়া দিলে ভাড়ার জন্যে। বিভূতি নিরুপায়ের মত বিজয়কে খুঁজতে গেল।

বিজয় তখন প্রতিমাকে বসাবার জন্যে ভিতরে চলে গেছে, টিকিট তারই কাছে রয়েছে।

এমন সময় বিজয় এসে পড়লো। সমস্ত শুনে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললে। ট্যাকসীওয়ালা আর টাকায় দু-আনা ছাড়লেনা। অনেকক্ষণ তাকে 'ডিটেন' হ'তে হয়েছিল।

ইনটারভ্যালে বিভূতি' ও বিজয়ের মধ্যে কথার পিঠে আবার 'রাষ্ট্র-ভাষা'র প্রসঙ্গ উঠলো। বিজয় বললে—বাংলার কোনও আশা নেই! এদেশে চোরও হিন্দি বলছে—ভিখারীও তাই! এমন সময় ভেণ্ডর এসে হাঁকলে—সোঁটা-লেমনেড! পান-সিগারেট—মিঠা পান!

বিভূতি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—বাংলার পুলিশকেও ডাকতে হয় হিন্দিতে!—"হায় রাষ্ট্রভাষা"!

হাসপাতালে গুপী কবিরাজ

ডাক্তারি চিকিৎসার ঘোরতর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও একটা কঠিন অস্ত্র চিকিৎসার জন্য গুপী কবিরাজকে বাধ্য হয়ে আসতে হ'ল শহরের এক বড় হাসপাতালে।

যাবার দিন রায়বাহাদুর গোপাল রায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, তোমার আয়ুর্বেদ বুঝি আর হালে পানি পেল না? শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি চিকিৎসারই আশ্রয় নিতে হ'ল।

গুপী কবিরাজ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন—আয়ুর্বেদ অগাধ সমুদ্র, হাল ধরতে জানলেই পানি পাওয়া যায়! শল্য-চিকিৎসার কাছে তোমাদের ডাক্তারি ত এখনও শিশু!

রায়বাহাদুর একটু হেসে বললেন—সেই শিশুরই ত দ্বারস্থ হ'তে হ'চ্ছে কবরেজ!

—নইলে উপায় কি বলো? দেশের চিকিৎসাকে অবজ্ঞা করে বিদেশী শাসন কর্তারা যে নিজেদের ক্ষুদ্র বিদ্যার অহংকারে তাঁদের অপরিণত চিকিৎসা শাস্ত্রটাই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলে! নইলে লাখো লাখো টাকার বিলিতি ওষুধ বিক্রী হবে কেমন করে? আর মোটা মাইনের সব 'আই, এম্, এস্'ই বা প্রতিপালিত হয় কিসে?

—আচ্ছা, তা না হয় মানলুম, কিন্তু তোমাদের শল্য-চিকিৎসাটা মরলো কিসে ? আয়ুর্বেদ বেঁচে থাকতে তার এ অকালমৃত্যুর কারণ কি ?

—কারণ কি—তা' যদি তোমার মত গর্দভেরা বুঝতো, তাহ'লে আয়ুর্বেদের আজ এ দুর্দশা হবে কেন ? শল্য চিকিৎসা ত আর পুঁথি পড়ে অধিগত হয় না ! হাতে-নাতে অস্ত্র ধরে এ চিকিৎসা শিক্ষা করা চাই।

—এই নিরস্ত্র পরাধীন দেশে তুমি অস্ত্র ধারণ করতে চাও ? তোমার সাহস ত কম নয় !

—তা হ'লে বঁটি, কাটারিগুলো বাড়ি থেকে বিদেয় করে দাও ! তোমার রায়বাহাদুরত্ব নিরাপদ হোক।

—ও-ও ! তোমাদের আয়ুর্বেদের শল্য চিকিৎসা বুঝি ঐ বঁটি কাটারির সাহায্যেই করতে হয ?

—তোমার মত রায়বাহাদুরকে কচু কাটা করতে হয় ?

—আহা ! চটো কেন কবরেজ ? আচ্ছা, একটা কথা বলতে পার ? সার্জারির নাম তোমাদের আয়ুর্বেদে 'শল্য-চিকিৎসা' হ'ল কেন ? ওটা কি চরক সুশ্রুতের কোন শ্যালক আবিষ্কার করেছিলেন ?

গুপী কবিরাজ কোনো উত্তর দিলেন না, চটে উঠে চাদরখানা কাঁধে ফেলে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

রায়বাহাদুর প্রাণ খুলে হো হো শব্দে হেসে উঠলেন।

গুপী কবিরাজ হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। রায়বাহাদুর তাঁকে 'কেবিনে' থাকবার খরচা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কবিরাজ তাতে সম্মত হন নি। 'একলা একখানা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকলে হাঁপিয়ে উঠবো বাবা। পাঁচজনের মুখ না দেখতে পেলে মরে যাবো'—এই বলে তিনি একরকম জোর করেই জেনারেল ওয়ার্ডের সাত নম্বর বেডটা বেছে নিয়েছিলেন।

তার ডান দিকে ছিল ছ'নম্বর বেডে একজন ডায়াবিটিসযুক্ত কার্বাংকল রোগী, আর বাঁ-দিকে ছিল আট নম্বর বেডে একজন ট্রাম থেকে পড়ে-যাওয়া পা-কাটা রোগী। দু'জনেই প্রায় কবরেজের সমবয়সী, কাজেই আলাপ জমে উঠতে বিলম্ব হয় নি।

কবরেজের কাল অপারেশন হয়ে গেছে। কিন্তু, যন্ত্রণায় সারারাত কাতরেছেন, ঘুমুতে পারেন নি। যতবার নার্সদের ডেকে বলেছেন—ওগো মাসি বাবারা! একটা কিছু ঘুমের ওষুধ দিয়ে বুড়াটাকে বাঁচাও—তারা বলেছে—সরি! সার্জনের অর্ডার নেই।

গুপী কবরেজ বলেন—দূর তোর সার্জনের নিকুচি করেছে! কে-সে? তাকে টেলিফোনে খবর দিয়ে একবার জেনে নাও না বাছা।

নার্স বলে—রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করবার হুকুম নেই। কাল সকালে তিনি যখন রাউণ্ড দিতে আসবেন তখন জেনে নেবো!

কবরেজ বলেন—এ কি রকম ব্যবস্থা তোমাদের মাসী বাবা! সারারাত না ঘুমিয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে মরবো—আর তোমরা কাল সকালে তার ব্যবস্থা করবে! এই জন্যেই কেউ হাসপাতালে আসতে চায় না! এখনি একটা উপায় করো মাসী, নইলে তোমাদের ভাল হবে না বলছি!

নার্স বললে—আচ্ছা, আমি হাউস সার্জনকে তোমার বিষয় জানাচ্ছি।

কবিরাজ বলেন—হাউস্ মাউস্ বুঝিনি বাবা, চটপট ঘুমিয়ে পড়ি এমন একটা ওষুধের ব্যবস্থা করো—যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিনি।

ক্ষণকাল পরে নার্স একশিশি ওষুধ নিয়ে এল। তা'তে তিন দাগ ওষুধ ছিল। গুপী কবিরাজকে তা থেকে একদাগ ঢেলে খাইয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে কবিরাজের যখন বেশ একটু তন্দ্রার মত ভাব সবে আসছে, নার্স এসে তাঁকে জেগে আছেন দেখে আর একদাগ ওষুধ খাওয়াতে গেল।

গুপী কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটা আবার কি? এ ওষুধটা কিসের?

নার্স বললে—ঘুমের ওষুধ।

কবরেজ বললেন—একটু আগে আমায় দিলে যে!

নার্স বললে—হ্যাঁ, ডাক্তার তিন দাগ ওষুধ দিয়েছেন। প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর একদাগ করে দিতে বলেছেন।

গুপী কবিরাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ঠিক জানো এ ঘুমের ওষুধ?

নার্স বললে—নিশ্চয়।

গুপী কবিরাজ ওষুধের শিশিটা দেখতে চাইলেন। নার্স শিশিটা তাঁর হাতে দিতে তিনি ঘুবিয়ে ফিরিযে দেখলেন সত্যিই ঘুমের ওষুধ! লেখা রয়েছে 'স্লিপিং ড্রাফট্'। তিন দাগও বটে! ডাইরেকশান রয়েছে 'ওয়ান ডোজ এভ্রি টু আওয়ার্স।' তিনি আর কিছু না বলে—ঔষধ সমেত শিশিটি ছুঁড়ে বারান্দায় ফেলে দিলেন।

নার্স উত্যক্ত হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, গুপী কবিরাজ তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন—নিজের কাজে যাও, বিরক্ত কোরনা। যে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দু-ঘণ্টা অন্তর একদাগ করে খেতে দেয় তার মাথায় মারি ঝাড়ু। রোগী ঘুমুবে—না, সারারাত ধরে দু'ঘণ্টা অন্তর তোমাদের ঐ ছাই পাঁশ দাওয়াই গিলবে? তোমাদের এ হাউস্-সার্জনকে 'ওয়্যার হাউসে' পাঠিয়ে দাও, হাসপাতালে রাখা ওকে নিরাপদ নয়।

সারারাত গুপী কবিরাজ ঘুমুতে পারেন নি। সকালের দিকে যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। তিনি যতই অস্থির হয়ে ওঠেন নার্সরা বলে—

'ওয়েট'! এখনি বড় সার্জন দেখতে আসবেন—ইম্পেশ্যেন্ট হয়োনা।

কবরেজ বললে—আমরা ত হস্‌পিটালের পেশ্যেন্ট্ হয়েই রয়েছি মাসীবাবা। তোমাদের অত্যাচারেই ইম্পেশ্যেন্ট হয়ে উঠছি। ব্যাণ্ডেজটা যে চড়চড় ক'রছে—একটু আল্‌গা করে দেনা বাবা!—

নার্স বলে—সার্জনের অর্ডার ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না।

গুপী কবিরাজ নিরুপায় হ'য়ে ব্যাকুল ভাবে সার্জনের শুভাগমন প্রতীক্ষায় মিনিট গুনতে থাকেন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ বড় সার্জন এসে ঢুকলেন ওয়ার্ডে। পিছু পিছু তাঁর জন কতক ছাত্র, হাউস সার্জন, সিস্‌টার, ওয়ার্ড-নার্স সে এক সমারোহ! গুপী কবিরাজ তাঁকে দেখেই চীৎকার করে উঠলেন, ও বাবা! একবার এদিকে এস ধন, সারারাত যন্ত্রণায় মারা গেলুম। দোহাই তোমার, বুড়োকে বাঁচাও!

রোগীর এই অসভ্যতায় সার্জনের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার গুপী কবরেজের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং গম্ভীর ভাবে প্রত্যেক বেড পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলেন।

গুপী কবিরাজ আরও বার দুই হাঁকা হাঁকি করলেন—ও সার্জন-সাহেব! ও বড় ডাক্তারবাবু মশাই! একবার দয়া করে এই বুড়োটাকে আগে দেখে যান। প্রাণ যায় দাদা! তীর্থের কাকের মত সকাল থেকে তোমার পথ চেয়ে পড়ে আছি। একবার এদিকে এস মাণিক।

সার্জন সমাদ্দার অধিকতর বিরক্ত হ'য়ে ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বেড পরিদর্শন করতে লাগলেন, কিন্তু গুপী কবিরাজের সাত নম্বর বেডে এলেন না। পাঁচ নম্বর, ছ'নম্বর দেখে তিনি একেবারে আট নম্বরে চলে গেলেন। দেখতে লাগলেন—নয়, দশ—

গুপী কবিরাজ অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—এদিকে আসবে—না আসবে না?—ডাক্‌ছি বলে বুঝি—ল্যাজ মোটা হয়ে উঠেছে? শীগ্‌গির এস বলছি!

সার্জন সমাদ্দারের সমস্ত বেড পরিদর্শন হবার পর তিনি ঘরের এক কোণ থেকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে তোমার? অমন অসভ্যর মত চেঁচাচ্ছ কেন?

গুপী কবিরাজ চেষ্টা করে শয্যার উপর খানিকটা উঠে তর্জনী সংকেতে সার্জনকে নিকটে আসবার জন্য ইঙ্গিত করে বললেন—এদিকে এস, ওখান থেকে পেশ্যেণ্টকে কিছু জিজ্ঞাসা করাটা তোমার পক্ষে কর্তব্য বা শিষ্টাচারের পরিচয় নয়।

সার্জন সমাদ্দার এবার নিকটে এসে ধমকে বললেন—'তুমি কি জাত? ভদ্রলোকের সংগে কথা বলতে শেখনি?

গুপী কবিরাজ গর্জন করে উঠলেন—Shut up! এটা কি তোমার বাবার জমিদারী পেয়েছ যে লাটসাহেবী মেজাজ দেখাতে এসেছ? তুমি যে মাইনে করা চাকার এটা কি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে? পাব্‌লিকের চাঁদায় এই হাসপাতাল চল্‌ছে। আমাদের পয়সায় তোমার অন্ন জুটছে এটা ভুললে চল্‌বে না! প্রত্যেক রোগী তোমার মনিব। আমাদের দেখবার জন্যই তোমায় মাসে মাসে মোটা টাকা দেওয়া হয়। তুমি দয়া করে—অনুগ্রহ করে—আমাদের দেখে কৃতার্থ করে দিচ্ছ মনে কোর না। আমরা ইচ্ছে করলে কালই তোমাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি জানো?

গুপী কবিরাজের কথা-বার্তা শুনে ও রকম-সকম দেখে স্টুডেণ্টরা, হাউস্ সার্জনরা, সিস্‌টার ও নার্সরা সব স্তম্ভিত!

আশপাশের বেডের রোগীরা কিন্তু সব মনে মনে পুলকিত!

গুপী কবিরাজ বলতে লাগলো—কতদিন থেকে এভাবে তুমি রোগী

দেখছ? আমার ডান পাশের বেডে—বাঁ পাশের বেডে গেলে, কিন্তু মাঝখানে আমার সাত নম্বর বেড বাদ দিয়ে গেলে—এর মানে কি? তোমার-খুশি-খেয়াল মাফিক কাজ করা হাসপাতালে চলবে না—বুঝলে? এসব চাল বাড়ীতে দেখিয়ো—এটা কর্মস্থল—

সিনিয়র হউস সার্জন বলে উঠলো—এই চোপরাও! পাগল নাকি তুমি? কাকে কি বলছো?—জানো উনি কে?

গুপী কবিরাজ বললেন—উনি যত বড় মহারথীই হোন না, আমাদের বেতনভোগী কর্মচারী ছাড়া ত' আর কিছু নন?

সার্জন সমাদ্দার রক্তবর্ণ মুখে হাউস্ সার্জনকে বললেন—এরকম ইন্‌সোলেণ্ট পেশেণ্টকে আমাদের হাসপাতালে রাখা চলবে না—আজই একে রিম্যুভ্ করে দিন—ক্যাম্বেল কিম্বা শম্ভুনাথ পণ্ডিতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। কালই সকালে আমি 'নাম্বার সেভেন বেড' খালি দেখতে চাই?

সার্জন সমাদ্দার ওয়ার্ড থেকে চলে যাওয়ার সময় গুপী কবিরাজ হেঁকে বললেন—কাল সকাল থেকে এ হাসপাতালে যাতে তুমি আর ঢুকতে না পাও আমিও সে ব্যবস্থা করবো—!

বেলা তিনটে চারটে নাগাদ রায়বাহাদুর গোপাল রায় ও অনারেবল জ্যাস্টিস্ ঘোষ সাত নম্বর বেডের সন্ধান করে এসে উপস্থিত হলেন হাসপাতালে গুপী কবিরাজকে দেখতে।

হাসপাতাল শুদ্ধ লোক তটস্থ! রায়বাহাদুর গোপাল রায় এই হাসপাতালে দশলাখ্ টাকা দান করেছেন। তিনি হাসপাতালের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট। জ্যাস্টিস্ ঘোষ ভিজিটিং কমিটির চেয়ার-ম্যান! হাসপাতাল শুদ্ধ লোক এঁদের চেনে এবং যত বেশী সম্ভ্রম করে তার চেয়েও বেশী ভয় করে।

গুপী কবিরাজ জ্যাস্টিস্ ঘোষের স্ত্রীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘোষ সাহেব বললেন—আপনার ওষুধে তিনি বেশ সুস্থ আছেন, তাঁর আর কোনও অসুখ নেই।

রায় বাহাদুর বললেন—ছ'মাসের জ্বরাতিসারগ্রস্ত রোগীকে তুমি যে রকম পোলাও কালিয়া খাইয়ে ছিলে আর কি তার অসুখ হবার উপায় আছে? কিন্তু সে থাক্, এখন তুমি নিজে কেমন আছ বলো?

গুপী কবিরাজ বললেন—তুমি যে-হাসপাতালের কর্ণধার, সেখানে রোগী কখনো সুস্থ থাকতে পারে? আহম্মকের মত দশ লাখ টাকা জলে দিয়েছ দেখছি।

তারপর রাত্রের ঘুমের ওষুধ থেকে আরম্ভ করে সকালে সার্জন সমাদ্দারের কাহিনী সবিস্তারে তিনি বর্ণনা করে গেলেন।

জ্যাস্টিস্ ঘোষ শুনে ভয়ানক চটে উঠে বললেন—রায়বাহাদুর! এসম্বন্ধে আমাদেব 'ইমেডিয়েট্ স্টেপ' নেওয়া উচিত।

গোপাল রায় শুধু গম্ভীর ভাবে বললেন—হুঁ!' তারপর অনেকক্ষণ বসে বয়স্য গুপী কবিরাজের সংগে নানা গল্প গুজব ও রঙ্গ-রহস্য করে পাঁচটার আগেই উঠে পড়লেন। কারণ পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত হাসপাতালে সাধারণের প্রবেশাধিকার। এঁরা সে নিয়মের অধীন নন।

সেইদিনই সন্ধ্যে সাতটার পর হঠাৎ সার্জন সমাদ্দার হাসপাতালে এসে উপস্থিত! হাঁসপাতালে একটা সাড়া পড়ে গেল। বরাবর সাত নম্বর বেডে এসে তিনি গুপী কবিরাজের হাতদুটি ধরে বললেন—আমায় মাপ করুন। আমার অন্যায় হয়েছে, আমি গুরুতর অপরাধ করেছি!

গুপী কবিরাজ বললেন—সে কি হাসপাতালেশ্বর! আমায় তাড়িয়ে না দিয়ে এযে উল্‌টো গাওনা শুরু করলে দেখছি। আমি ত ক্যাম্পবেলে যাবার জন্য রেডি!

সার্জন সমাদ্দার বললেন—আর আমায় লজ্জা দেবেন না। বলুন ক্ষমা করলেন—

গুপী কবিরাজ বললেন—আরে, আমি একটা ছেঁড়াকাঁথা বুড়ো হাবড়া পথের ভিখিরি—দয়া করে হাসপাতালে স্থান দিয়েছ—এই আমার বাপ চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। আমি তোমায় ক্ষমা করবার কে? তুমি হলে একটা এতবড় মহামান্য সার্জন সাহেব!

—দেখুন, আমি আপনার পরিচয় জানতুম না। রায়বাহাদুর আমাকে ফোনে বললেন—আপনি হচ্ছেন দেশবিখ্যাত কবিরাজ—

—বাপুহে! আবার ভুল করছো! পরিচয়ের সংগে তোমার কি দরকারটা শুনি! তোমার কাছে আমাদের সকলের শুধু একটি মাত্র পরিচয়—আমরা তোমার পেশেন্ট!—সকলকে সমানভাবে যত্ন করে দেখবে—এই হ'ল তোমার ডিউটি! চিকিৎসা ঠিক হচ্ছে কিনা—রোগী কষ্ট না পায়—এইগুলো দেখাই তোমার কাজ—

—নিশ্চয়! আপনি যা বলেছেন খুব ঠিক—

—আর সকালে তোমায় যা বলছিলুম—

—সমস্তই উচিত কথা বলেছেন—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর কখনো এমন কাজ করবো না।

—গুপী কবিরাজ মুখের কথায় ভোলেনা সার্জন সাহেব। আমি দেখতে চাই তোমার সত্যিই আক্কেল হয়েছে কিনা?

তার পরদিন থেকে দেখা গেল রোগীদের সে কী যত্ন করে দেখা! নার্স, হাউস্‌সার্জন, সিস্‌টার, সবার ভোল যেন একেবারে বদলে গেছে! একবারের জায়গায় সাতবার করে এসে তত্ত্বাবধান করা, যাতে কারুর কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে সর্বদা তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা। গুপী কবি-রাজের ত' কথাই নেই! যে কদিন ছিলেন একেবারে রাজার হালে ছিলেন বলা চলে।

যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরবেন, ওয়ার্ড শুদ্ধ রোগীর দল কাকুতি মিনতি করতে লাগল—দোহাই

আপনার, আর কিছুদিন থেকে যান! আপনি চলে গেলে আমাদের কি দুর্দশা হবে।

গুপী কবিরাজ তাদের আশ্বাস দিয়ে এলেন—তিনি মাঝে মাঝে হাসপাতালে ঘুরে যাবেন।

ক্রস-ওয়ার্ড

আমার বেহারা শম্ভু কাহার দার্ভাঙ্গা জেলার লোক। বাংলা দেশে এসেছে অনেক দিন, কিন্তু, সুস্পষ্ট বাংলা বলতে এখনও শেখেনি। অবশ্য বাংলা বলবার চেষ্টা করে সে খুবই, কিন্তু হিন্দুস্থানী টানটা কিছুতে আর যায় না।

একদিন 'রেজিষ্টার্ড এণ্ড ইনসিয়োর্ড' কভারে তার নামে ডাকে এক চিঠি এলো। খামের উপর বড় বড় ক'রে লেখা 'হাজার টাকার জন্য'। ভাল করে পড়ে দেখলুম নাম শম্ভু কাহার ঠিকই লেখা আছে, ঠিকানা যা দেওয়া রয়েছে তা আমারই ঠিকানা বটে। কেয়ার অফ—আমারই নাম! শম্ভুকে ডাকলুম। ডাকপিয়ন বললে—আপনি 'আইডেনটিফাই' করে একটা নাম সই দিন। দিলুম শম্ভুকে সনাক্ত করে এক সই মেরে। ডাক-পিয়ন শম্ভুকে দিয়ে রসিদ খানায় তার হিন্দি সই নিয়ে চিঠি ডেলিভারি দিয়ে চলে গেল।

খাম খুলে দেখা গেল, শম্ভু কাহারের নামে একখানি ১০০০৲ টাকার ক্রস্‌ড চেক এসেছে সাদার্ন ব্যাঙ্কের উপর। চেক্ পাঠাচ্ছেন 'ক্যালকাটা ক্রস্ ওয়ার্ড কম্পিটিশন কোম্পানী'। সঙ্গে এক চিঠি। তাতে ক্যালকাটা ক্রস্‌ওয়ার্ড কোম্পানীর ম্যানেজার লিখেছেন :—

সবিনয় নিবেদন—

প্রিয় শম্ভুবাবু, গত মাসের 'কাকলি'তে প্রকাশিত 'শব্দ-চিকে'র নির্ভুল উত্তর পাঠাইয়া আপনি প্রথম পুরস্কারের একতৃতীয়াংশ অর্জন করিয়াছেন। এজন্য আপনাকে আমাদের বিশেষ অভিনন্দন জানাইতেছি। কারণ, পাচ হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে কেবলমাত্র তিনজন সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দিতে পারিয়াছেন। আপনার অংশের প্রাপ্য পুরস্কার পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। ইতি—

আমার বিস্ময়ের আর শেষ নেই! বাংলা হরফ চেনা দূরে থাকুক, এখনও যে ভাল করে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না, সে কিনা বাংলা মাসিক পত্র 'কাকলি'র 'শব্দ-চিক' পূরণ ক'রে পাঠিয়ে প্রথম পুরস্কার পেলে!

মনে কেমন একটা খটকা লাগলো। নিজে বাংলা জানি ও লিখতে পারি বলে অভিমান পোষণ করি। বাংলা ক্রস-ওয়ার্ডের সমাধান পাঠিয়ে পুরস্কার পাবার চেষ্টা যে নিজে ইতিপূর্বে কয়েকবার না করেছি তা নয়, কিন্তু প্রতিবারই হেরেছি। অনেকগুলো টাকা জলে গিয়ে শেষ 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকাছেঁড়ার মত' একবার একটা প্রতিযোগিতায় মাত্র ॥৶০ ন'আনা পয়সা পেয়েছিলুম! তিন ভুলে তৃতীয় পুরস্কার ৩৬৫ জনের মধ্যে ভাগ হয়েছিল সেবার! এই 'ক্রস-ওয়ার্ড' প্রতিযোগিতায় যখন যোগ দিয়েছিলুম তখন সরল বিশ্বাসেই মাসের পর মাস প্রবেশিকার টাকা জমা দিয়ে পাঠিয়েছি, প্রতি কুপন পিছু ওদের ফী হিসাব করে। এই অপব্যয় থেকে আমাকে রক্ষে করলে বিশু। বিশু আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে!

বিশু বহুদিন বেকার ছিল। দু'টাকা চার টাকা মাঝে মাঝে আমার কাছে ধার বলে চেয়ে নিয়ে যেত, যা কোনও দিনই সে শুধতে পারত না। হঠাৎ দেখি এক সময় তার অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে।

সে নিজে এসে যেচে আমার পাওনা টাকাগুলো মিটিয়ে দিয়ে গেল!

জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কিরে বিশু। চাকরি-বাকরি কিছু পেয়েছিস না কি?

বিশু বললে—ওইতো আমাদের জাতের দোষ মামু! চাকরি ছাড়া জীবিকার্জনের আর কোনো উপায়ই তারা খোঁজে না—ভাবে না।

বললুম—সোজা কথায় বল দেখি কিসের ব্যবসায় নেমেছিস?

বিশু বললে—বাংলা দেশে বোকা লোকের সংখ্যা বড় কম নয়। আমি তাদের উপর বাণিজ্য শুরু করেছি—!

—অর্থাৎ—

বিশু বললে—অর্থাৎ, বেকার ত্রাণরূপ যে ক্রসওয়ার্ড অবতার উদয় হয়েছেন এই কর্মহীন যুগে, কলকাতার শহরে আমি তাঁরই শরণ নিয়েছি। 'শব্দব্রহ্ম' নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ বার করেছি। প্রতি সপ্তাহে তাতে 'ক্রস-ওয়ার্ড কম্পিটিশন' থাকে। প্রবেশিকা যা পাওয়া যায়, তাতে খরচ খরচা বাদ কিছু কিছু পুরস্কার দিয়েও হাতে যা থাকে সারা জীবন চাকরি কবলেও তা উপার্জন করতে পাবতুম কিনা সন্দেহ।

ক্ষণকাল বিস্ময়ে অবাক হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—'পুরস্কার কিছু কিছু দিয়ে মানে'? নির্ভুল উত্তর পাঠালে,তাকে-তো তোমরা পুরস্কার দিতে বাধ্য।

বিশু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে—নিশ্চয় বাধ্য, অবশ্য যদি সে আমাদের দলের লোক হয়, নইলে রেস্ত বুঝে ব্যবস্থা—অর্থাৎ, প্রথম পুরস্কারের অংশীদার বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যদি দেখি সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাইরের লোক বাইচান্স আমাদের 'সিক্রেট ক্লু' অর্থাৎ গোপনীয় সংকেত-সূত্রের শব্দটিও সন্ধান করে ফেলেছে এবং নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছে তখন চটপট আরও কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা সৃষ্টি করতে হয়। ফলে প্রথম পুরস্কার ৩০০০৲ হাজার

টাকার পরিবর্তে তাঁকে ৩০০৲ টাকা দিয়েই খুশী করে দিই। তিন শত টাকাই বা কম কি? ক্যুপনের জন্য যদি দশটা টাকাও খরচ করে থাকো তা'হলেও ৩০০৲ টাকা যদি পাও মামু, সেটা কি তুমি বলতে চাও তোমার কম লাভ? এমনি করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যখন ভাগ করে ফেলি তখন দেখা যায় সব রকম পুরস্কার বিলি করতে মোট পাঁচ শ' টাকাও লাগে না। বাকি চার-পাঁচ হাজার টাকা আমাদের হাতে থাকে। আনন্দ-বাজারে বিজ্ঞাপন ছাপা, 'শব্দব্রহ্ম' পত্রিকার যাবতীয় খরচ, পোস্টেজ, শব্দ সন্ধান রচয়িতার পারিশ্রমিক ইত্যাদি কতকগুলো বাঁধা ব্যয় ছাড়া আর তো কোনো খরচ হয় না। কাজেই প্রায় সেণ্টপার্সেণ্টের উপর আমাদের লাভ থাকে।

আমি শুনে একেবারে স্তম্ভিত! বললুম—সবাই কি এই রকম করে? 'পুরস্কার প্রাপ্ত'গণের নাম ঠিকানার যে তালিকা মাসে মাসে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে অধিকাংশই বুঝি তোমাদেরই নিজেদের দলের লোক?

—'আলবাৎ!' বিশু জোর করে টেবিল চাপড়ে বললে—নইলে জন-সাধারণের হিতার্থে এত হাঙ্গামা পোয়াবার আমাদের কী এমন মাথা ব্যথা পড়েছে! অবশ্য, আমাদের এটা লোক ঠকানো ব্যবসা বটে, কিন্তু মামু, তুমি কি বলতে পারো আমাকে—এমন কোনও ব্যবসা আছে যাতে শেষ পর্যন্ত একদল লোককে না ঠকিয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব? বোকা যারা তারা চিরকালই চালাক লোকদের কাছে ঠকে আসছে। 'ক্রস-ওয়ার্ড কম্পিটিশন'ও তাদের জন্যেই চলে।

একটু চিন্তিতভাবেই বললুম—কিন্তু, কি ক'রে এ সম্ভব হয় তাত বুঝতে পারিনি! তোমাদের এ জুয়াচুরি কি প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা নেই মনে করো?—

বিশু বললে—প্রথমতঃ, বাংলাদেশের কোনো লোকের এত উৎসাহ

নেই যে, আমাদের কারবার সততা করছে, কি করছে না, তার সন্ধান নেবার জন্য সে সময় দিতে ও পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়তঃ— আমাদের পলিসিই হচ্ছে যে 'দিও কিঞ্চিৎ কোরোনা বঞ্চিত'! কিছু পেলেই লোকে খুশী হয়। আরও পেলুম না কেন বলে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে চায় না। এই হচ্ছে এদেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃতি। তারা 'শব্দব্রহ্ম' পত্রিকার অফিসের ঠিকানা জানে, আর 'ম্যানেজার' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। আমার নাম তারা কেউ শোনেও নি, ঠিকানাও জানে না। সুতবাং প্রথমবারই নির্ভুল উত্তরের জন্য নিরাপদে প্রথম পুবস্কার পেলুম আমি! তারপর পুরস্কার পেলেন আমাব স্ত্রী, তারপর আমার পুত্র, তারপর আমার কন্যা, তারপর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তারপর আমার শ্যালক—

বাধা দিয়ে বললুম—থাক্, বুঝতে পেরেছি। বাংলাদেশেব বোকার দলের মধ্যে যে আমিও একজন তা জানতুম না! এখন বেশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রতে পারছি। আচ্ছা, আর একটা কথা জেনে নিতে চাই। তোমরা যে বড় বড় হবফে প্রতিবারে লিখে দাও 'ইহাব নির্ভুল সমাধান শীলমোহরাঙ্কিত হইয়া অমুক ব্যাঙ্কের হেপাজতে আছে'। এটা কি সত্যি?

—সত্যি! ওটা নিয়ে আর মিথ্যে বলবার উপায় নেই মামু। যে ব্যাঙ্কেরই নাম করি না কেন, যদি প্রকৃতই সেখানে ওটা গচ্ছিত না রাখা হয়, ব্যাঙ্ক তখনি সংবাদপত্রে নোটিশ দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাহ'লেই মারা যাবো! তবে, সুবিধে কি জানো; শীলমোহর ভেঙে নির্ভুল উত্তরটি বার করে 'শব্দব্রহ্মে' ছাপতে দেয় কে? আমরাই ত! সুতরাং কোন্ উত্তরটা নির্ভুল সেটা স্থির করা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই হাতের মুঠোয় থাকে! যদি দেখি দু'টো 'অল্টারনেটিভ' শব্দের মধ্যে একটাকে নির্ভুল ধরলে অনেক লোকের উত্তর নির্ভুল হয়ে যায়, তখন সেটার

পরিবর্তে অপরটা এসে বসে আমাদের লাভের অংশ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য !

একটা নমস্কার করে বিশুকে বলেছিলুম যে—বাঁচালি বাবা ! আজ থেকে ওই শব্দ-প্রতিযোগিতার নেশা ছাড়লুম। প্রকাশ্যভাবে আর বোকার দলে ভিড়তে রাজি নই !

সেই থেকে আমি ও-পাপ চুকিয়ে দিয়ে বসে আছি। আজ হঠাৎ আমার দ্বারভাঙ্গা জেলার মেড়ুয়াবাদি বেহারা শম্ভু কাহার বাংলা ক্রসওয়ার্ডের প্রথম পুরস্কার হাজার টাকা পেয়েছে দেখে আমার রক্ত একেবারে গরম হয়ে উঠেছিল !

জেরা শুরু করে দিলুল—এ রুপেয়া কাঁহাসে আয়া জান্‌তা ? কাহে আয়া জানতা ? কৌন্ ভেজা জান্‌তা ?

শম্ভূ বলে—এ রূপেয়া তো জরুর আনেকা বাত থা সরকার ! সুরয কাহার হাম্‌নে খবর ভেজাথা হুজুর—ইয়ে বাংলা বোলিকো বাজী মার দিয়া হামরা নামসে !

বুঝলুম—সুরয কাহারের সঙ্গে কথা না বললে এর কোনো কিনারা করতে পারবো না। জিজ্ঞাসা করলুম—সুরয কাহার তোম্‌রা কৌন্ লাগতা !

—কোই নেই হুজুর ! উয়ো তো হাম্‌রা দেশওয়ালা দোস্ত্ হ্যায় !

বললুম—তাকে আজই ডেকে নিয়ে এসো, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই !

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর—!' ব'লে শম্ভু তার কাজে চলে গেল। হাজার টাকার চেক খানা আমার কাছেই রইল।

সুরয কাহার এসে যা' বললে তার মর্মার্থ হ'চ্ছে 'কাকলি'র এই ক্রস্‌ওয়ার্ড সে একজন বাংলা পণ্ডিতের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে শম্ভু কাহারের নাম ঠিকানা দিয়ে জমা দিয়েছিল, কারণ, সুরষ ঐ "ক্যালকাটা ক্রসওয়ার্ড কম্পিটিশন কোম্পানী'র অফিসেরই দ্বারবান। অফিসের

কোন লোকের এই 'বাংলা বোলি বাজী' খেল্‌বার হুকুম নেই, তাই দেশওয়ালা ভাই শম্ভুর নামে সে এই বাজী খেলেছে।

সুরযের একথা শুনে হাজার টাকার চেকখানা আমি তাকে দিয়ে বললুম তাহ'লে শম্ভুর কাছে এটার পিছনে সই করিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দাওগে। এটা ক্রসড্ চেক, এমনি তো তোমাকে টাকা দেবে না।

শম্ভু বললে—হামার নামে বেঙ্কিমে একটা হিসাব খুল দিন্ সরকার, এ চিক্ হামার নামে আছে। হামার নামে জোমা হবে।

সুরয তাতে আপত্তি করলে না। বললে—বেশত, তাই ক'রে দিন হুজুর। তারপর শম্ভুর কাছে আমি টাকাটা নিয়ে নেবো।

চেকখানা সাদার্ণ ব্যাঙ্কের উপর ছিল ব'লে দিলুম সাদার্ণ ব্যাঙ্কেই শম্ভুর নামে একটা একাউণ্ট খুলবার জন্য দরখাস্ত লিখে, আর তার সঙ্গে হাজার টাকার সেই চেক।

ওরা ত্থ'জনেই চেক আর দরখাস্ত নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

তারপর অনেকদিন আমি আর কোন খোঁজ খবর নিইনি। একদিন সন্ধ্যের পর বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখি আমার বাইরের ঘরের বারান্দায় জন পাঁচ ছয় হিন্দুস্থানী জড়ো হয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করছে। আমাকে দেখেই সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা সেলাম ঠুকলো। জিজ্ঞাসা করলুম—কি চাও তোমরা ?

তারা বললে—হুজুর! আপনার বেহারা শম্ভু সেই বাংলা বোলি বাজীর হাজার টাকার চেক সুরয কাহারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চলে এসেছে। ব্যাঙ্কে জমা দিচ্ছে না, সই করেও সুরযকে ফেরৎ দিচ্ছে না, গরীবের টাকাটা মিছে আটকে রেখেছে।

শম্ভুকে ডেকে এর কৈফিয়ৎ চাইতে শম্ভু বললে—হুজুর! ও আমার টাকা! পণ্ডিতজীকে দিয়ে আমিই ওই 'বাংলা বোলি বাজী' লিখিয়ে সুরযের হাতে পাঠিয়েছিলুম। সরকার গোঁসা হবে বলে ভয়ে আমি

আগে বলিনি।

এখন সেই পণ্ডিতজীকে না পেলে কে যে এই 'বাংলা বোলি বাজী' লিখিয়ে নিয়েছিল তা' বোঝা শক্ত। বললুম—পণ্ডিতজীকে ডেকে নিয়ে এসো। কে তোমরা তাঁর কাছে লিখিয়ে নিয়েছ আমি জানতে চাই তাঁর কাছে!

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর!" বলে দলবল চলে গেল সে-রাত্রের মত।

গৃহিণীকে গিয়ে বললুম—শম্ভু বেটাকে তাড়াতে হ'ল দেখছি। বেটা জোচ্চোর। সুরয কাহারের টাকাটা ফাঁকি দেবার মতলবে আছে। গিন্নী বললেন—কক্ষনো না। চোর ঐ সুয্যি বেটা! শম্ভু আমার এত কালের পুরনো লোক, একটা পয়সা কখন চুরি করেনি। কলতলায় একবার অমার হাতের চৌদ্দ ভরির সোনার বালা, কানের দামী দুল ফেলে এসেছিলুম। ও কুড়িয়ে এনে দিয়েছিল। সেদিন বালিশের তলায় আমার দশভরির সোনার হার ফেলে উঠে গেছলুম। শম্ভু বিছানা করতে গিয়ে আমায় বার করে এ[illegible] দিলে। অমন চাকর কি হয়? অরণ্যের গতর! সারাদিন খাটে যেন অসুরের মত! ওকে তাড়ালে কিন্তু আমি তোমার সংসার দেখতে পারবো না। চেক তো শম্ভুর নামে এসেছে। সূর্য বেটা কোথাকার কে? উড়ে এসে জুড়ে বসে ওতে ভাগ বসাতে চায়! টাকা শম্ভুকেই দিয়েছে কোম্পানী, সূর্যকে ত' আর দেয়নি!—

বুঝলুম, তর্ক বৃথা। উপরন্তু, বেশী কথা কইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কাও আছে। আমার গৃহিণীটীকে পাড়ার লোকে কহলপ্রিয়া বলে বটে, কিন্তু আমি জানি তা' নয়, তিনি ঈষৎ মুখরা! আমার ছোট বোন যদিও বলে "একটু নয় দাদা,—বিশেষ! তুমি বৌদির কোন দোষই দেখতে পাও না!"—আমি তা স্বীকার করিনে।

পরদিন সকালে নিয়ে এলো শম্ভু সেই বাঙালী পণ্ডিতকে ধরে।

বয়সে তরুণ হলেও বচনে বেশ পাকা মনে হ'ল। পরিচয়ে জানলুম কিছুদিন হ'ল তিনি ওকালতী ব্যবসা করছেন। স্বীকার করে গেলেন 'কাকলি'র ক্রসওয়ার্ড তিনিই সমাধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে টাকা না থাকায় শম্ভু টাকা দিয়ে তাঁর নিজের নামেই ওটা পাঠাতে বলে, কিন্তু তিনি ওটা শম্ভুর নামেই পাঠিয়েছিলেন।

এরপর এ বিষয়ে শম্ভুর সম্বন্ধে কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ করাও আমার বাড়ীতে অসম্ভব হয়ে উঠলো। গৃহিণী বললেন—তুমি উদ্যোগী হ'য়ে ওর চেকখানা ভাঙ্গিয়ে ব্যাঙ্কে একটা হিসেব খুলে ওর নামে জমা করিয়ে দাও। শম্ভু এইবার দেশে গিয়ে বিয়ে করে আসবে।

হেসে বললুম—এমন কাজ কোরো না গিন্নী! তা হ'লে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হবে। বিয়ে করলে ও ঘন ঘন ছুটী নিয়ে দেশে ছুটবে।

গৃহিণী নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বললেন "না, ওকে পশ্চিম দিকের নিরিমিষ হেঁসেলের পাশের ছোট ঘরখানা ছেড়ে দেবো বলিছি। ও বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে আসবে এখানে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই খাটবে।

'হোম পলিটীক্স' বুঝিনি বিশেষ। হার মানতে হ'ল। বাহবা দিয়ে বললুম—"তুমি দেখছি একেবারে সাক্ষাৎ—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত!

আমার নিজের ব্যাঙ্কেই শম্ভুর নামে একটা একাউণ্ট খোলবার ব্যবস্থা করে এসে যেদিন বললুম—চেকখানা নিয়ে আয় শম্ভু, আজ তোর নামে জমা পাঠাবো। শম্ভু চেকখানা তার কাঠের বাক্স থেকে বার করতে গিয়ে বিপন্নের মতো চীৎকার ক'রে উঠলো! তাড়াতাড়ি আমরা দৌড়ে গেলুম তার ঘরে। বলা বাহুল্য যে, সেই পশ্চিম দিকের ছোট ঘর শম্ভু ইতিমধ্যেই দখল করে বসেছিল এবং ভাবী বধূর আগমন আশায় ঘরখানিকে সুসজ্জিত করতেও শুরু করেছিল। পুরাতন এ্যালমানাকের ছবিতে, নূতন কাপড়ের উপর থেকে তুলে নেওয়া ছবিতে এবং সিগারেটের

প্যাকেটের ভিতরকার অসংখ্য ছবিতে দেওয়ালের আধখানা প্রায় ঢাকা পড়েছিল এই ক'দিনেই!

দেখলুম—তার কাঠের বাক্স ভাঙ্গা! সব জিনিষই আছে। কেবল সেই চেকখানাই নেই! অনুসন্ধানে জানা গেল দুপুরে ওর একজন দেশের লোক দেখা করিতে এসেছিল। ও তখন আমার স্ত্রীর জন্য বড়বাজার থেকে ডালমুট, ঝুড়ি-ভাজা ইত্যাদি আনতে গেছলো। বামুন ঠাকুর তাকে শম্ভুর ঘরে বসতে বলেছিলো। অনেকক্ষণ সে লোকটা ঘরে বসেও ছিল। কিন্তু, কখন চলে গেছে কেউ জানে না। বোঝা গেল সে ঐ কার্য করতেই শম্ভুর অনুপস্থিতিতে ইচ্ছাপূর্বক এসেছিল। কিন্তু কে সে? উড়ে ঠাকুর কিছুতেই তার বর্ণনা দিতে পারলে না। একবার বলে—টিকি আছে, একবার বলে—নেই, একবার বলে—গোঁফ ছিলো, একবার বলে—না, মনে পড়ছে না। গায়ের রং, পরণের কাপড়, মাথার টুপি কোনটারই সে এমন কিছু নি[illegible]শ দিতে পারলে না যাতে চট করে লোকটাকে চেনা যায়। শম্ভু বললে—এ শালা সুর্যির কাজ!

ব্যাপারটা যদি এইখানেই মিটে যেতো, মন্দ হ'ত না। কিন্তু গৃহিণীর প্ররোচনায় শম্ভু গিয়ে করলে পুলিশে ডায়ারী। চললো এ-নিয়ে জোর তদন্ত। তার ফলে পড়লো সুয্যি ও শম্ভু দু'জনেই ধরা। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড!

পুলিশের অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সুয্যির হাতে দিয়ে 'কাকলির' ক্রস্ওয়ার্ড সমাধান ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছিল, সুয্যি সেটিকে খুলে 'কাকলির' একটি কুপনে নির্ভুল উত্তরটি দেখে দেখে হাতে নকল করে নিয়ে আবার খাম এঁটে শীলমোহর করে তারপর দিন ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিল। সুয্যি বাংলা হরফ্ চেনে, বাংলা পড়তেও পারে। অফিসের বাংলা শীলমোহরের চাবী থাকে তারই কাছে। শম্ভু তার নিজের নাম ঠিকানা দিয়েছিল কিছু ভাগ পাবার আশায়। পরে 'হাজার টাকার চেক'

পাওয়া গেছে শুনে আমার গৃহিণীরই পরামর্শে সে ও টাকাটা তার নিজের বলে দাবী করে। একজন জুনিয়ার উকীলকে সে দুটো টাকা দিয়ে টেনে এনেছিল সেদিন বাঙালী পণ্ডিত সাজিয়ে।

পুলিশ কোর্টে মামলা চললো কিছুদিন ধ'রে। শম্ভুর উপর ছিল এডিং এণ্ড এ্যাবেটিংয়ের চার্জ! ভাল উকীল দিয়ে অনেক খরচ ক'রে শম্ভুকে যেদিন 'বেনিফিট অফ্ ডাউটের' ধোঁকার সাহায্যে খালাস ক'রে বাড়ী নিয়ে এলুম—সেদিন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, সেই হাজার টাকার চেকখানা শতখণ্ডে ছিন্ন অবস্থায় শম্ভুর সেই ছোট্ট ঘরের মেঝেয় উড়ে বেড়াচ্ছে!

লছমন্

আমরা তখন ছেলেমানুষ। স্কুলে পড়ি।

বাবা সরকারি দপ্তরে বড় চাকৃরি ক'রতেন। হঠাৎ বদ্‌লি হ'য়ে গেলেন। আমরা গোয়াড়ী থেকে একেবারে গোরক্ষপুরে এসে পড়লুম। আমাদের বাড়ীর বাঙালী চাকর হরিচরণ দেশ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এতদূর আসতে চাইলে না। চাকৃরি ছেড়ে দিলে। কাজেই, এখানে এসে একজন নতুন চাকর রাখা হ'ল। তার নাম—লছমন। সে হিন্দুস্থানী। গোরক্ষপুরেই তার বাড়ী।

লছমনকে রাখবার সময় মা তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে নিলেন—এই তোম্ হাম্‌লোক্‌কা বাঙালী বাত্ বুঝ্‌তে করতে পারতা হ্যায়? মা আমার এর চেয়ে ভালো হিন্দি ব'লতে পারতেন না।

মার সেই না-হিন্দি না-বাংলা কথা শুনে লছমন তার মস্ত পাগড়ী বাঁধা মাথা নেড়ে মাকে লম্বা সেলাম ঠুকে বললে—জী হুজুর!

মা খুশী হ'য়ে তাকে রাখলেন।

কিন্তু, প্রথম দিনেই টের পাওয়া গেলো যে—বাংলা সে মোটেই বোঝে না। তবুও মা তাঁর সেই 'না-হিন্দি না-বাংলা' কথাতেই তাকে নিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাংলা শেখাতেও শুরু করে দিলেন। কাজের সুবিধে হবে বলে।

লছমন ছিল খুব চট্‌পটে! চক্ষের নিমেষে সে সব কাজ ক'রে ফেলত'। ইঁদারা থেকে ঘড়া ঘড়া জল তোলা, বাট্‌নাবাটা, বাসন মাজা, সাবান দিয়ে কাপড় কাছা, ঘর দোর ঝাড়া-মোছা, বিছানা করা, বাবার তামাক সাজা—সব কাজ সে একাই ক'রতো।

কিন্তু, মুস্কিল বাধ্‌লো তার ওই বাংলা কথা না-বুঝেও-বুঝতে পেরেছি বলায়। কারণ, মা তাকে যখনই যা কিছু ফরমাইস্ করতেন তখনই এ কথাটাও জিজ্ঞাসা করে নিতেন—বুঝ্‌তে করতে পার্‌তা হ্যায়? লছমনও তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে লম্বা সেলাম ঠুকে ব'লতো—জী হুজুর!

একদিন মা তাকে একটা টাকা ভাঙাতে দিয়ে তাঁর সেই হিন্দি ভাষায় বললেন—এই রূপিয়াকো ভাঙায়কে নিয়ায়। লছমন তৎক্ষণাৎ সেলাম ঠুকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। খানিক পরেই মস্ত বড় একটা কাগজের ঠোঙা হাতে করে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলে—ইয়ে কি আভি পিশ্‌নে হোগা?

মা ব'ললেন—নেই—নেই! বাটনা ত' সব বাটা হ'য়ে গেছে! আর তো কিছু মস্‌লা পিশ্‌নে নেই হোগা! তোম্ যাও, ওই টাকাটা ভাঙায়কে লেআও।

লছমন সবিনয়ে বললে,—রূপেয়াকা তো ভাঙ্‌লে-আয়া মাইজী।

মা ব'ললেন—কই দে। রেজকী এনেছিস্ ত? না সব পয়সা? ষোল আনা গুণ্‌কে আনা হ্যায় তো?

লছমন সেলাম ঠুকে ব'ললে—হাঁ হুজুর! পূরা ষোরা আনাকো ভাঙ্ লেআয়া।" বলেই সে কাগজের ঠোঙাটা এগিয়ে ধরলে মা'র

সামনে। সেটা হাতে নিয়ে মা দেখলেন—তাঁর লছমন চাকর একটি ঠোঙা ভর্ত্তি 'সিদ্ধি' কিনে এনেছে—এক টাকা দিয়ে! মা ত' রেগেই খুন! মাথা কপাল চাপ্‌ড়ে বাবার কাছে গিয়ে বলে দিলেন যে লছমনকে তিনি একটা টাকা ভাঙাতে দিয়েছিলেন, সে এক টাকার সিদ্ধি কিনে এনেছে!

বাবা শুনে খুব হেসে বললেন—ঠিকই করেছে! এদেশে যে ওরা 'সিদ্ধি'কে ভাঙ্ বলে জানোনা? তুমি ওকে 'এক রূপেয়া ভাঙায়কে লেআও' বলছো—ও বুঝেছে তুমি এক রূপেয়ার ভাঙ্ আনতে বলেছো!

লছমন বাজার করতে গিয়ে আরও অনেক বার এই রকম ভুল করে মা'র কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল। দু চারটে ঘটনা আমার আজও মনে আছে। একবার আমার খুব অসুখ হয়েছিল। ডাক্তার বেদানার রস খেতে বলে গেলেন। মা তৎক্ষণাৎ লছমনকে ডেকে বেদানা আনতে দিলেন। বারবার বলে দিলেন যেন বেশ বড়ো দেখে বেদানা নিয়ে আসিস—কারণ রস তৈরি হবে।

লছমন্ 'জো হুকুম!' বলে সেলাম ঠুকে ঝাঁ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে সদর বাজার ঘুরে আমার জন্যে বেশ বড় দেখে একটা তামার বদ্‌না কিনে এনে হাজির করেছিল!

আর একবার দিদিকে সঙ্গে নিযে আমাদের জামাইবাবু এসেছিলেন —গোরক্ষপুরে বেড়াতে। তখন ডিসেম্বর মাস, খুব কন্‌কনে শীত! মা জামাইবাবুর জলখাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গোরক্ষপুরে সন্দেশ পাওয়া যায় না—ক্ষীরের বরফি পাওয়া যায়। মা লছমনকে পয়সা দিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে বলে দিলেন—খাস্তার কচুরি, টাটকা সিঙাড়া, কালাকাঁদ বরফি, অমৃতি জিলিপি, বালুশাই গজা, বটিয়া দরবেশ—এই সব খাবার হিঁয়া যা-যা মিলতা হায় তাড়াতাড়ি লেআও!

লছমনও সেলাম ঠুকে 'জো হুকুম!' বলে এক লাফে বেরিয়ে চলে

গেলো। অন্য দিন সে দোকানে যায় আর ছুটে চলে আসে। একটুও দেরী করে না। সেদিন কিন্তু লছমনের আর দেখা নেই! বিকেল ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। জামাইবাবুর জলখাবার দিতে দেরী হচ্ছে। মা অস্থির হয়ে ঘরবার করছেন, কিন্তু লছমন আর ফেরে না!

সন্ধ্যে যখন বেশ ঘনিয়ে এলো, দোকানে দোকানে আলো জ্বালা হতে শুরু হ'য়েছে, লছমনের ফিরে আসার আর সম্ভাবনা নেই মনে করে মা ষ্টোভ্ জ্বেলে ঘরেই জামাইবাবুর জন্য হালুয়া-লুচি তৈরি করে দেবার আয়োজন ক'রছেন, এমন সময় বাইরে থেকে লছমনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো! কাকে যেন সে খুব খাতির করে বলছে—আইয়ে জনাব আলি, অন্দরমে আইয়ে—

একটু পরেই লছমন সব জিনিপত্র নিয়ে ভিতরে এলো। মাথায় একটা কলসী। সঙ্গে তার প্রকাণ্ড দাড়ীওয়ালা আলখাল্লা পরা একজন মুসলমান ফকীর। এত দেরী হলো কেন মা তাকে জিজ্ঞাসা করতেই লছমন লম্বা সেলাম ঠুকে করুণ কণ্ঠে জানালে যে—দরবেশ আনতে তাকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল। তাই দেবী হল। শহরের চারিদিক সে খুঁজেছে—কোথাও দরবেশ মেলেনি। শেষে, একজন ভুঁজাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে তাকে বাতলে দিলে যে শহরের বাইরে ইমামবাড়ীতে পাওয়া যাবে।

মা তাকে বাধা দিয়ে ধমকে উঠে বললেন, দরবেশ পাওয়া গেল না ত' ফিরে এলিনে কেন? শহরের বাইরে তোকে কে যেতে বলেছিল? আমি না তোকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে দিয়েছিলুম?

লছমন আবার ঘাড় নেড়ে সেলাম ঠুকে বললে—হাঁ হুজুর! হুকুম সব কুছ্ তামিল! আচ্ছা তাড়িভি লেআয়া! তারপর সে মাকে বুঝিয়ে বলতে গেলো যে শহরের বাইরে গেলেও এত দেরী তার হতনা, কিন্তু কি করবে সে—পথে নমাজের সময় হয়ে গেলো, দরবেশ সাহাব

কোম্পানী বাগিচায় নমাজ পড়তে বসলেন, অগত্যা তার ফিরতে দেরী হল--শুধু তাড়ি কেন সব জিনিসই সে গুছিয়ে এনেছে—বলে মাথার উপর থেকে মস্ত এক তাড়ির ভাঁড় সামনে রকের উপর নামিয়ে দিলে!

মা'ত রেগেই খুন! তাড়ি আনতে তোকে কে বলেছিল? আমি তোকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলুম—বলে গালাগালি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—খাবার কইরে মুখপোড়া—গাধা। তোকে যে জামাইবাবুর জন্যে টাটকা সিঙাড়া, কালাকাঁদ, বর্ফি, বালুশাই, গজা, সব আন্‌তে দিয়েছিলুম—কই সে সব?

লছমন সেলাম ঠুকে বললে—সবকুছ লে-আয়া হুজুর! তারপব গামছার একটা ভিজে কোনের গাঁট খুলে বার করে দিলে সেই পৌষ-মাসের শীতে করাতের গুঁড়োমাখা এক ড্যালা বরফ্! বললে—লিজিয়ে হুজুর! কলকা—বরফ-ইয়ে! তারপর সন্তর্পণে ট্যাক থেকে একটা কাগজে মোড়া গাঁজার পুরিয়া বার করে দিয়ে বললে—ইয়ে লিজিয়ে হুজুর, জামাই বাবুকা আস্তে বালাশ্বরকা গাঁজা! তারপব গামছার আর এক কোন খুলে একরাশ 'পানফল' রকের উপব ঢেলে দিয়ে ব'ল্লে—ইসসে বঢ়িয়া তাজা সিঙাড়া আউর নেহি মিলা, হুজুব! পরে তার পিছনে যে ফকীর সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এইবার তাকে সেলাম ঠুকে মার কাছে এগিয়ে এনে বললে—ইয়ে লিজিয়ে হুজুব আপকা 'দরবেশ' ভি হাজির! বহুৎ তক্‌লিফ্ সে ইন্‌কো মিলা!—

জামাইবাবুর জলখাবার থেকে ভাগ পাবাব লোভ যে আমাদের মনে মনে ছিল না এ কথা ব'লতে পারবো না। কিন্তু, লছমন যে এমন কাণ্ড ক'রবে তা'—মা কেন—আমরাও কেউ স্বপ্নে ভাবিনি! এদেশে 'পানফল'কে যে এরা 'সিঙাড়া' বলে সেদিন প্রথম জানলুম। কোথায় 'কালাকাঁদ বরফি' আসবে, তা না লছমন কিনে নিয়ে এলো কিনা—এই শীতে কল্‌কা বরফ! 'বালুশাই গজার' বদলে নিয়ে এলো কিনা—

'বালেশ্বরের গাঁজা !' 'দরবেশ' মেঠাইও কি ও বেটা কখনো খায়নি ? নিয়ে এলো কিনা ইমামবাড়ীর মস্‌জিদ থেকে এক লম্বা দাড়ীওয়ালা ফকীর সাহেবকে ধরে ! মা বলে দিলেন ওকে তাড়াতাড়ি আনতে— আর ও নিয়ে এল কিনা একভাঁড় তাড়ি ! ভয়ানক রেগে উঠে মা' যখন লছমনকে—দূর হ'—বেরো—এখনি বিদেয় হ'য়ে যা—ব'লে বক্‌ছেন, সেই সময় বাবা বাড়ীর ভিতর এসে পড়লেন। মাকে বললেন, একটা পান দাওতো শীগ্‌গির ! ওষুধ খেয়ে মুখটা কেমন তেতো বোধ হচ্ছে !

লছমন শুনতে পেয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে এক সেলাম ঠুকে 'জো হুকুম !' ব'লে ছুটে গিয়ে এক বালতি জল এনে বাবার সামনে ধরলে। বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়ে কোন্ তুমকো লেয়ানে বোলা ? লছমন সেলাম ঠুকে ব'ললে—আভি' ত আপ্ এক টব পানি মাঙা মাজীনে !—

বাবা লছমনের কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়ে মার দিকে ফিরে চাইতেই মা তাঁর সব রাগ ভুলে গিয়ে খু... নিক হেসে উঠে বললেন—হাড় জ্বালাতন করলে তোমার এই হতভাগা চাকর ! একটা পান চাইলে আমার কাছে,—তাই শুনে দৌড়ে গিয়ে এক টব পানি এনে হাজির ক'রেছে তোমার সামনে ! এতেই তুমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছ ! আর এদিকে একবার চেয়ে দেখো কী কাণ্ড !

তারপর সেই দাড়ীওয়ালা 'দরবেশ' থেকে আরম্ভ করে তাড়ির ভাঁড় ও বালেশ্বরের গাঁজা সবই একে একে মা দেখালেন তাঁকে। কলের বরফ তখন প্রায় গলে এসেছে !

সেই রাত্রেই দরবেশকে নগদ কিছু বখশিশ দিয়ে বিদেয় করে— বাবা লছমনকে জবাব দিলেন।

ব্ল্যাক্-আউট্

নিষ্প্রদীপের মহড়া দেবার জন্য সন্ধ্যা সাতটায় শহর আজ অন্ধকার হবে।

বাড়ীতে তৃতীয় পক্ষের তরুণী পত্নী একা আছেন। তাড়াতাড়ি যাতে বাসায় ফিরতে পারি সেই হিসেবে সত্বর অফিসের কাজ সারতে গিয়ে একটা বেফাঁস ভুল হয়ে গেল।

বড়সাহেবের তলব এল। দুর্গানাম জপ করতে করতে কামরায় ঢুকে এক মস্ত সেলাম ঠুকলুম। বেটা পঁচিশ বছরের উপর কলকাতাব ফার্মে কাজ করছে। তিনশ টাকার জুনিয়ব এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ থেকে আজ অফিসের 'সিনীয়র পার্টনার' হয়েছে। বাঙালী কেরাণীর হাড়হদ্দ সে জানে। বললে—হোয়াট্ ইজ দিস্ ব্যানার্জি ? এরকম সিলি মিস্‌টেক্ কি করে হ'ল ?"

অপরাধীর ন্যায় নতমুখে মাথা চুলকোচ্ছি দেখে সাহেব বললে—নিশ্চয়ই তোমার কাজে মন ছিল না। তুমি বোধ হয় ভাবছিলে—টো-নাইটস্ ব্ল্যাক-আউট ! ইজ ইট্ নট ?

একটু কেসে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে আবার একটা সেলাম ঠুকে বললুম—ইয়েস্ সার ! এক্সকিউজ মি সার ! ডার্ক নাইট বি সার, ইয়ং ওয়াইফ্ এ্যালোন সার ! মাইণ্ড্ আপসেট্ সার ! এ্যাফ্রেড্ এয়ার রেড সার !

সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন—যাও, কেয়ারফুল হয়ে কাজ করগে। ডোণ্ট্ বি সিলি ! দেয়ার উইল বি নো বম্ব্‌স্ !

সাহেবের হাসি দেখে ধড়ে প্রাণ এলো। যাক্ ফাঁড়া কেটে গেছে আবার এক সেলাম ঠুকে চলে এলুম।

ঘরে এসে বাবুদের বললুম—ওহে, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন—তোমাদের কোন ভয় নেই 'ব্ল্যাক-আউট' হচ্ছে বটে, কিন্তু দেয়ার উইল বি নো বম্ব্স্!

ডিপার্টমেণ্টে একটা ডেঁপো ছোঁড়া আছে, বলে উঠলো—ব্ল্যাক-আউট যখন হচ্ছে সার, বোমা পড়তে কতক্ষণ? আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ কালীপদ গ্র্যাজুয়েট্। কথায় কথায় সে ইংরিজি বলে। গম্ভীরভাবে আওড়ালে—**If winter comes—**

ডেঁপো ছোঁড়াটা বললে—**Will spring be far behind?**

যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরেও সাড়ে ছ'টার আগে আর অফিস থেকে বেরুতে পারলুম না। আসবার সময় সেই ডেঁপো ছোঁড়াটা দিলে মাথা খারাপ করে। বললে—বাড়ীর সদর দরজায় চাবির ব্যবস্থা আছে ত সার? খিড়কিটাও 'ল্যক্-আপ' করে রাখবেন কি জানি আজ এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কোনো বেটা যদি ঢুকে পড়ে! চোর-ছ্যাঁচড়ের ত অভাব নেই দেশে। আজ বেটাদের মাহেন্দ্র যোগ!

চোর-ছ্যাঁচড়ের জন্য আমি তত ভাবি নি। আমার দুর্ভাবনা হচ্ছিল দিগম্বরীতলার গোটাকতক বিশ্ববওয়াটে ছোঁড়ার জন্য। আমারই বাড়ীর সামনে শিস্ দিয়ে তারা যখন তখন ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যের সময় শুনতে পাই আনাচে কানাচে বসে বেটারছেলেরা যত পঙ্কজ-সায়গলী টপ্পা ধরেছে। আমায় দেখতে পেলেই বলে—ওইরে! 'হুলো' বেটা বেরিয়েছে!

আজ যদি ওরা অন্ধকারে উৎপাত করে কিছু, আমি ঠিক থানায় গিয়ে খবর দেব। আমাদের পাড়ার এ-আর-পি ওয়ার্ডেনকে ডেকে এনে বলবো বেটারা—'ফিফ্থ্ কলম!' সিভিল গার্ডের দারোগাকেও ধরে আনব?

এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে টালিগঞ্জের ট্রাম ধরবার জন্য ডালহৌসি থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছিলুম। ডালহৌসি থেকে ট্রামে উঠলে এক পয়সা বেশী নেয় যে! অফিসের বাবুদের কাছে অবশ্য বলি—ডাক্তার বলেছে বিকেলে আমায় একটু হাঁটতে, নইলে 'ব্লাড প্রেশার' হবে।

রাস্তার দু'ধারে তখন সব আলোই জ্বলছে—ওয়েস্ট এণ্ড, কুক কেলভি—জেম্‌স ম্যরে—একটার পর একটা 'দেউড়ি ঘড়ি' দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল গম্ গম্ করছে। ফার্পোর পেলিটি রেস্তোরাঁয় বেশ ভীড। গভর্নমেণ্ট হাউসেও দেখলুম সব আলো জ্বলছে।

ধর্মতলার মোড়ে কে সি দাসের 'রসোমালাই' জ্বল জ্বল করছে। ব্রিস্টল হোটেলের পাশে 'নব ভাবত' নবীন তেজে উজ্জ্বল! মেট্রো হাউসের দীপাবলী নিত্য সন্ধ্যার মতই প্রদীপ্ত। দেখলে কিছুই বোঝা যায় না যে আর একটু পরেই এ শহর একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। মনে একটা সন্দেহ হল!—তবে কি তারিখ ভুল করেছি না কি? ব্ল্যাক-আউট কি আজ নয়?

রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ অফিসের বড সাহেবের কথাটা মনে পড়ে গেল!...**perhaps you were thinking of to-night's Black-out!......**

ব্যস! সমস্ত সংশয় নিঃশেষে দূর হল। সাহেব যখন বলেছে—ও কি আর না হয়ে যায়?

সাতটা বাজতে না বাজতেই সমস্ত আলো নিভে গেল। সারা কলকাতা মনে হল যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিলে সর্বাঙ্গে!

ট্রামে উঠতে গিয়ে গা'টা ছম ছম করে উঠলো! গোটা গাড়ীখানা

সমস্ত আলো ঢেকে গুড় গুড় করে চলেছে যেন একটা কোনো ভৌতিক কাহিনীর রহস্য-যান! মাঝে মাঝে ট্রামের টিকির সঙ্গে মাথার উপরের তারের সংঘর্ষে যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে সেটা মনে হচ্ছে ঠিক প্রেতের হাসি বা অপদেবতার দাঁত খিঁচুনি!

গাড়ীতে উঠে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলুম না। চোখে যেন কেমন একটা আঁধারে-ধাঁধাঁ লেগে গেল! মনে হ'ল গাড়ীখানা যেন খালি যাচ্ছে। বাঁ-দিকের লেডিজ সীটের পিছনে যে একটি একানে আসন আছে, সেইটি হল আমার ফেভারিট সীট। পাছে আর কেউ উঠে প'ড়ে সেটা দখল ক'রে বসে এই- ভয়ে—আমি ব্যস্ত হ'য়ে গিয়ে সেখানে বসে পড়লুম।

আতঙ্কগ্রস্ত কোনো মহিলার মিহি গলার একটা অতি সকরুণ আর্তনাদ উঠল!

সর্পদষ্টের মত আমি চমকে লাফিয়ে উঠলুম!

গাড়ীর মধ্যে একটা ভীষণ গুঞ্জনাপূর্ণ কোলাহল উঠলো: লোকটা কাণা নাকি? বেটা বদমায়েস! কী রকম ভদ্রলোক? ঘাড় ধরে নামিয়ে দাও! অন্ধকারে দেখতে পাননি! থাক থাক, যেতে দিন— ইত্যাদি ভৎর্সনা, তিরস্কার, উপহাস, অট্টহাস্য এবং সহানুভূতি ও সদয়োক্তি একত্রে মিলে মিশে আমার কানে ও দুরু দুরু প্রাণে চাবুকের ন্যায় কশাঘাত করছিল। •

চোখ তখন অন্ধকার অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ভীত চকিত দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি গাড়ী লোকে লোকারণ্য! 'ন স্থানং পোস্ত ধারয়েৎ!' তিল ত দূরের কথা। সেই কোনের একানে সীট খানিতে বসেছিলেন ঘুটঘুটে কালো রঙের শাড়ী পরা একটি ভারতীয় বর্ণ বৈশিষ্ট্যের আদর্শ নিদর্শণ স্বরূপা নিখুঁত কৃষ্ণকায়া বাঙালীর মেয়ে!

কম্পিত করজোড়ে ক্রোধোন্মত্ত ক্ষিপ্ত সহযাত্রীবৃন্দের কাছে যথা-

বিহিত বিনীত কণ্ঠে সম্মান পুরঃসর ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। প্রাণের দায়ে তৃতীয়পক্ষের কথা বিস্মৃত হয়ে প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করলুম সেদিন, যে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এবং রাত্রে চোখে ভাল দেখতে পাইনি। তার উপর আজকের এই অন্ধকার গাড়ীতে—

ব্যস্, আর বলতে হল না। ট্রাম স্টার্ট দিতেই আমি টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লুম এবার ডানপাশে সামনের বেঞ্চে উপবিষ্ট ক্ষীণকায় এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে!

সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠলো। উচ্চহাস্যের বিরাট অট্টরাগে গাড়ী ভরে গেল! এমন কি দু'খানি লেডিজ সীটে উপবিষ্টা চার বয়সের চার জাতীয় চারটি মহিলার সঙ্গে ক্ষণপূর্বের বিধ্বস্ত কালোবরন তরুণীটিও সশব্দে হেসে উঠলেন!

ভীষণ অপ্রতিভ ও দারুণ বিভ্রমের লজ্জায় আমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। কাবুলী-মালকোচা ধরণে কাপড় পরা, স্যাণ্ডেল পায়ে একটি ছোক্‌রা টপ্ করে উঠে পড়ে আমাকে ধরে তার নিজের সীটে বসিয়ে দিয়ে পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ব্যস্ত হয়ে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললুম—সে কি! না না, এ হতে পারে না। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসব—এও কি হয়—

আমাকে ধমক দিয়ে ছোকরা বললে—স্থির হয়ে বসুন, উঠবেন না; নইলে অক্ষত শরীরে আজ আর বাড়ী ফিরতে হবে না—

মনে মনে ছেলেটিকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম। গলা শুকিয়ে উঠেছিল। পানের ডিপে থেকে একটা পান নিয়ে মুখে দিলুম। পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি বার করে ধরাবার জন্য যেই দেশলাই জ্বেলেছি—কণ্ডক্টর তেড়ে এল—হাঁ হাঁ, বাবু, ম্যাচ জালিয়ে মৎ—হুকুম নেইহি! আমি ত থতমত খেয়ে গেলুম! বিড়িটা

মুখ থেকে টপ করে খসে পড়ে গেল। দেশলাইয়ের কাঠিটাও জ্বলন্ত অবস্থায় পাশের লোকের কাপড়ের উপর ছিটকে পড়ল।

কণ্ডক্টর তাড়াতাড়ি সেটা নিবিয়ে দিয়ে গাড়ীতে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়া নিবারণ করলে। এই দুর্ঘটনায় পাশের ভদ্রলোক এমন কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেরালেন, যে—রামায়ণ মহাভারতের যুগ হলে আমি নিশ্চয়ই ভস্ম হয়ে যেতুম! ভদ্র লোক অতঃপর নিবিষ্ট মনে তাঁর কাপড় পরীক্ষা করতে লাগলেন—পুড়েছে কিনা।

লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটের মোড় থেকে চারজন 'বয় স্কাউট্‌' হৈ হৈ করে আমাদের ট্রামে উঠে পড়ল। তাদের কথাবার্তা ও আলোচনা থেকে বোঝা গেল তারা 'নিউমার্কেট' পেট্রল করে ফিরলো।

ছোকরারা চলন্ত গাড়ীতে টাল সামলাতে পারছিল না। মাথার উপরের ঝুলন হাতোল ধরে ডাইনে বাঁয়ে আঁটা কালো পাইপের সরু খুঁটি দুটি আঁকড়েও টলমল ক[illegible]ল। দু'ধারি উপবিষ্ট যাঁরা সবাই তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন—এই বুঝি ঘাড়ে পড়ে!

কাবুলী-মালকোচা পরা ছেলেটি তাদের অবস্থা দেখে বললে—ব্যালান্স্ ঠিক রাখতে শেখনি এখনও, বয়স্কাউট হয়েছ? আমি যখন বক্সিং শিখতুম তখন সবার আগে আমাদের শিখতে হয়েছিল ব্যালান্স্ ঠিক রাখা। বাঁ পাটা একটু হাঁটুর কাছে দুমড়ে সামনে এগিয়ে রাখ, আর ডান পাটা ঠিক তার রাইট্‌এ্যাংগেলে 'স্টীফ্ এণ্ড স্ট্রেট্' রাখ, তাহলে আর গাড়ীর ধাক্কায় পড়বেনা কিছুতেই। বাঁ পাটা স্প্রীংয়ের মত কাজ করবে, গাড়ী নড়ার শক্ এ্যাবসর্‌ব্ হবে ওতে। আর ডান পাটা হল supporting post!

ছেলেরা মহা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—দেখিয়ে দিন না সার! কী ভাবে দাঁড়াতে হবে—

সে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ পদযুগল বিস্তার করে হাতে কলমে প্র্যাক্‌টি-

ক্যাল ট্রেনিং দিতে শুরু করে দিলে। বললে—'আর্ট অফ ব্যালান্সিংয়ের পাস্ট-মাস্টার হচ্ছে এ দেশের নৌকোর মাঝিরা। নৌকো চড়েছ নিশ্চয়। নৌকো চলার সময় পরস্পর বিপরীত দুরকম ইণ্টারমিটেণ্ট মোশন দেখতে পাওয়া যায়। একরকম হল ডাইনে বাঁয়ে হেলে পাশ-দোলা। আর একরকম হল লম্বালম্বিদিকে দু'মুখ ওঠা নামা করা see-saw প্যাটার্ণের দোলা! অনেকটা এই রকম আর কি—বুঝেছেন?—বলেই সে ছেলেটি নৌকা দোলার অনুকরণে দুরকম করেই দুলে দেখিয়ে দিতে শুরু করলে! ট্রামগাড়ী যেন অকস্মাৎ ব্যালান্স্ শেখাবার ট্রেনিং গ্রাউণ্ড হয়ে উঠল।

পার্ক স্ট্রীট পার হতে না হতে রাস্তার দু'ধারি সব দোকানের আলো টপাটপ নিভে গেল! পাঁচ সাত জন যাত্রী দেখি ট্রামের বাতি ঢাকা ঘেরাটোপের ফাঁক দিয়ে যে ক্ষীণ আলোক রশ্মি ঠিকরে বেরুচ্ছিল তারই সামনে হঠাৎ নাজী স্যালুটের ধরণে ডান হাতের বদলে বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরলেন। ব্যাপারটা কি প্রথমে বুঝতে পারিনি। একটু হক্‌চকিয়ে গেছলুম। আমিও ওদের মত হাত বাড়াব কিনা ভাবছি এমন সময়ে দেখি সবাই যে যার কব্জীর উপর হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে ঘড়ি দেখছেন!

জনৈক কৌতূহলী প্যাসেঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন—সাতটা কি বেজে গেছে মশাই? উত্তরে একজন বললেন—না, পাঁচ মিনিট বাকি আছে। আর একজন বললেন—না, এখনও দশ মিনিট বাকি। আর একজন বললেন—আজ্ঞে না, ঠিক সাত মিনিট বাকি। আমার ঘড়ি আজ একটার তোপের সঙ্গে মিলিয়েছি। আর একজন বললেন—সে কি মশাই? আমি যে একটু আগে 'ওয়েস্ট্ এণ্ডের' ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিলুম! তৃতীয় বললেন—আমার ঘড়ি মশাই ঘোড় দৌড়ের মাঠের স্টার্টারদের

'ক্রনোমিটার' ঘড়ির সঙ্গে মেলানো—বুঝেছেন? ওয়ান সিক্‌স্‌টিয়েথ্‌ পার্ট অফ এ সেকেণ্ড ভুল হবার যো নেই!

গাড়ি কিন্তু 'আর্মি নেভি স্টোরের' কাছাকাছি আসতেই 'সাইরেণ' বাজতে সুরু হয়েছে শোনা গেল। আবার সব ঘড়িওয়ালাদের বাঁহাত আলোর সামনে প্রসারিত হ'ল। এবং, আশ্চর্যের বিষয় যে—সকলেই এবার একবাক্যে বলে উঠলেন—ঠিক্ সাতটা!

ট্রামের কণ্ডক্টর সর্ব কর্ম ফেলে ছুটে এসে ঝুপ্‌ ঝাপ্‌ ক'রে গাড়ির 'শাটার'গুলো ফেলে দিলে! দ্বারভাঙ্গার মহারাজার মৎসলাঞ্ছিত প্রাসাদ ক্ষণ পূর্বে আলোক মালায় ঝল্‌মল করছিল; অকস্মাৎ তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

শাটর্‌বন্ধ গাড়ির ভিতর গরমে প্রাণ যায়, ভীড়ে সাফোকেশন হবার উপক্রম! এক একজন করে শাটার্‌ তুলতে আরম্ভ করলে। কণ্ডক্টর আপত্তি করলে, বললে—খিড়কি ·৲ উঠাইয়ে বাবু! হুকুম নেহি। ভদ্রলোকেরা ক্ষেপে উঠলেন। বললেন—দম বন্ধ হয়ে কি মরেগা? পাঙ্খা খোল দেও তব্।

'জরুর খোল্ দেগা' বলে কণ্ডক্টর ড্রাইভারকে পাখা খুলে দিতে বললে। ভন্ ভন্ করে তিনখানা পাখা ঘুরতে শুরু হল। গাড়ির পিছন দিকে সম্ভবত একজন শীতভীত বা রুগ্ন লোক ছিলেন। তিনি মহা-চিৎকার শুরু করলেন—কি বাবা, নিউমোনিয়া ধরিয়ে মারবে? বন্ধ কর পাখা? কাঁপুনি ধরে গেল যে! শাকভাত খেয়ে এত গরম হ'ল কোন বাবুর হে?

•

গাড়ি তখন এলগিন রোডের মোড়ে এসেছে। দু'ধারি দোকান পাট হুড়মুড় করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পথে আসতে আসতে লক্ষ্য করে-ছিলুম জুয়েলারী দোকানগুলো বিকেল থেকেই কোল্যাপসিবল টেনে

বন্ধ করে রেখেছে। এলগিন রোডের মোড়ে একটি মেম সাহেব গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই ডিসেম্বরের রাত্রেও তাঁর পরণে একটি ফিন্ ফিনে পাতলা ছিটের খাটো ফ্রক। জানু পর্যন্তও নামেনি সেটি! দেখে শুনে আমার গলার কম্ফর্টারটা টেনে নিয়ে বেশ করে কান ঢেকে জড়িয়ে ফেললুম!

গাড়িতে একজন টিকিট চেকার উঠলো। হৈ চৈয়ের মধ্যে এতক্ষণ আমার টিকিট নেওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করতে গিয়ে দেখি—ব্যাগ উধাও! আমার ত মুখ শুকিয়ে উঠলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল সেই শীতের সন্ধ্যাতেও!

আমি যখন মণিব্যাগ খুঁজছি পাশের ভদ্রলোকটি বললে—মশাই 'পার্স্ টা' আজ একটু সাবধানে রাখবেন—

বলেই তিনি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে অনতিদূরে উপবিষ্ট একজনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠল। মণিব্যাগটি যে পকেটে খুঁজে পাচ্ছিনে একথা প্রকাশ করতে কেমন লজ্জাবোধ হ'ল। অথচ, এখনি নেমে যাওয়া, বা টিকিট নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই! চেকার ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল পানের ডিবেয় একটা 'দুয়ানি' আছে। অফিসে আসবার সময় স্ত্রী সেটি দিয়েছিলেন তাঁর পশমবোনার একটি ক্রুশের কাঠি কিনে নিয়ে যাবার জন্য। তাড়াতাড়ি সেটি বার করে কণ্ডক্টরের হাতে দিয়ে বললুম—টালিগঞ্জ একখানা।

কণ্ডক্টর দুয়ানিটি আলোক রশ্মির সামনে ধরে উল্টে পাল্টে দেখে বার দুই বাজিয়ে ফেরত দিলে। বললে—বদলে দিন, এটা চলবে না!

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! তার উপর 'মড়ার কাঁধে খাঁড়ার ঘা' দিয়ে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—মশাইয়ের বুদ্ধি

বুদ্ধি একটু কম মনে করেছিলুম! এখন দেখছি আপনি আমাদের সবার চেয়ে চালাক! ট্রামে অচল 'দুয়ানি' চালাবার পক্ষে To night is the night! এমন কি মন্থলি টিকিটও আজ যে কোন সেক্সানের একখানা সঙ্গে থাকলেই 'অল সেক্‌শান' ঘুরে আসা চলবে!

গাড়িতে আবার একটা হাসির রোল উঠলো! আমি তখন দস্তুর মত ঘেমে উঠেছি। ঐ দুয়ানিটি ছাড়া আমি তখন কপর্দকহীন! কাতর ভাবে বললুম—ওটাত অচল নয়। আমি যে রেজকি ভাঙিয়ে আনি একেবারে কারেন্সি অফিস থেকে।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটি বললেন—আপনার কারেন্সির ওরকম দুয়ানি আর কটি নিয়ে আজ বেরেয়েছেন মশাই? ক্ষোভে অপমানে লজ্জায় আমি একেবারে মরমে মরে গেলুম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল—ধরণী দ্বিধা হও!

. .

গাড়ী জগুবাবুর বাজারের সামনে এসে পড়ল। মস্তবড় এক খাবারের ঠোঙা হাতে একজন মোটা ভদ্রলোক ট্রামে উঠলেন। ভবানীপুর তখন অন্ধকার! কাঁসারী পাড়ার কতকগুলো ছেলে ট্রাম রাস্তায় বেরিয়ে এসে হৈ চৈ করছে।

মোটা ভদ্রলোকটি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠল—আরে! আরে! খুড়ো যে! বলি আঁধার রাতে আজ অভিসারে বেরুনো হয়েছে বুঝি? রোসো; কালই গিয়ে খুড়িমাকে জানিয়ে আসব—এত ভাল কথা নয়!

কণ্ডক্টরের ফিরিয়ে দেওয়া দোয়ানিটা আমি তখনও মনোযোগ দিয়ে দেখছিলুম—সত্যিই সেটা অচল কিনা! হাবুলের গলার সাড়া পেয়ে চমক ভাঙল। দোয়ানিটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললুম—দেখতো বাবাজী এটা চলবে কিনা? হাবুল না দেখেই বললে—খুব চলবে। ইংরেজ

রাজত্বে অচল বলে কোনো জিনিস নেই। না মন্ত্রীমণ্ডলে—না সরকারী অফিসে—না মেডিক্যাল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে—

বললুম তুই এটা রেখে দু'আনা পয়সা দে। কণ্ডক্টর এটা নিতে চাচ্ছে না। আমার কাছে আর কিছু নেই! হাবুল বললে—ওটা তোমার কাছেই থাক খুড়ো। আমি তোমায় বরং একখানা টিকিট কিনে দিচ্ছি। কিন্তু খুড়ির হাতের কড়াই শুঁটির কচুরী খাওয়াতে হবে একদিন!

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! উঃ! ভগবান মান রক্ষে করেছেন!

গাড়ী পূর্ণ থিয়েটারের কাছে এসে পড়ল। একটি পাঞ্জাবী মেয়ে এখানে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। একদল ছেলে ছোক্‌রা অন্ধকারে পূর্ণ থিয়েটারের সামনে খুবই হট্টগোল করছিল। এক ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন—একটি আটাশ টনী বোমা পড়লে নাচা-কোঁদা বেরিয়ে যাবে বাছাধনেদের।

বয়স্কাউটের ছেলেরা প্রতিবাদ করে বললে—কেন মশাই? 'এ-আর-পি' শেল্টারে গিয়ে আশ্রয় নেবেন তখন। তা'বলে আমোদ প্রমোদ বন্ধ করতে হবে কেন? জানেন? লণ্ডনে আজ ১৫ মাস ধরে 'ব্ল্যাকআউট' হচ্ছে? বোমা পড়ারও কসুর নেই! তাবলে কি কাজ কর্ম বন্ধ করে, আমোদ প্রমোদ ছেড়ে দিয়ে বসে আছে তারা? রামঃ! বাড়ী ভেঙে উড়ে গেছে। পিয়ানোটা কোনো রকমে বেঁচে গেছল! সেইটেকেই রাস্তায় টেনে নিয়ে এসে তারা সারা রাত নাচ গান করে কাটিয়ে দিচ্ছে—বুঝেছেন?

—আরে রেখে দাও, হ্যাঁঃ! তোমাদের মতো ডেপো ছেলে আমি ঢের দেখেছি। বোমা পড়লে তখন দাঁত কপাটি লেগে যাবে। আর নাচ গান করতে হবে না!

আর এক ভদ্রলোক এঁকে সমর্থন করে বললেন—তা ছাড়া, ওদের 'অণ্ডার গ্রাউণ্ড শেল্টার' রয়েছে, 'টিউবওয়ে-রেলের স্টেশন' রয়েছে, আমাদের কী আছে? যত বাজার, ইস্কুল, বড় লোকের বাড়ি এ-আর-পি শেল্টার করা হয়েছে। অন্যলোকের বাড়ি যদি শেল্টার হতে পারে তাহলে আমাদের নিজেদের বাড়িই বা হবে না কেন?

বয়স্কাউটরা বললেন—আপনি ভুল করছেন। ও ব্যবস্থা হয়েছে পথিকদের জন্য। আপনাকে নিজের বাড়ি ছেড়ে বাজারে এসে দাঁড়াতে বলছেনা কেউ!

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

কিন্তু আর একজন বলে উঠলের—হ্যাঃ! 'ব্ল্যাক আউট' না ছাই! শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা ঘেঁষে এর ব্যবস্থা করা মানে—তামাসা করা।

আর একজন এঁকে সমর্থন করে বললেন—জতা কতাই কয়েছেন মুশোয়—ইসে, আহাশে যদি আঞ্ ম্যাগ লা হইত, তবে ত এহানে দ্বাদশীর চন্দ্র ইসে আলোয় পুল পুটাইত!

হাবুল হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—ঠিক বলেছেন। আমাদের উপর ত সন্ধ্যে থেকে আলো নিবিয়ে বসে থাকবার হুকুম হল; ট্রাম গাড়িগুলোও তো দেখছি আষ্টে পৃষ্ঠে মুড়ি দিয়ে আলো ঢেকে চলেছে; কিন্তু চাঁদ ঢাকবার ব্যবস্থাটা করবে কে?

কালীঘাট ডিপোয় গাড়ী এসে পড়লো। এখানে মাড়োয়ারী মহিলা একটি আর বেহারী কালোয়ার বধূ একটি গাড়ি থেকে নেমে গেল। বয়স্কাউটদের মধ্যেও একজন এখানে নামলো। বাকি তিনজন তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালে। একজন বললে—Wish you a Dark journey Home!

আর একজন বললে—Wish you a Black journey Home!

তৃতীয়টি বললে—Wish you a no-light-way Home!

রাসবিহারী এ্যাভেনিউর মোড়ে এসে গাড়ি দাঁড়াল। সেই কৃষ্ণবরণা বাঙালী তরুণীটি এখানে নামলেন। হাবুল বললে—দেখেছ খুড়ো, বাঙালীর মেয়ের সাহস? একলা এই অন্ধকারে 'ব্ল্যাক আউট' দেখতে বেরিয়েছে! একটু ভয়-ডর নেই প্রাণে!

গাড়ির এক কোন থেকে বেশ গম্ভীর ভাবে কে একজন বলে উঠলেন —At last Kanan says—yes!

হো হো করে গাড়িশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। আমি হাবুলকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার হাতে অত বড় একটা ঠোঙা কিসের বাবাজী?

হাবুল বললে—তোমার বউমা ত আর আমাদের খুড়ির মতো অন্ধকারে ভেল্‌কি দেখাতে পাবে না! রান্নাঘরেও 'ব্লাক আউট'! কাজেই বাজার থেকে দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা যোগাড় করে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

বললুম—খাবে কি করে অন্ধকারে?

হাবুল বললে—হাত মুখ চেনে খুড়ো! তাতে কোনো অসুবিধা হবেনা। লোকসান আমাদের কিছু নয়, লোকসান যা হবার হ'ল— ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর! এই একদিনে অন্তত লক্ষ টাকা মারা গেল তাদের।

অন্ধকার-পথ বেয়ে অন্ধকার গাডী ধীরে ধীরে টালিগঞ্জের দিকে চললো।

আমার কেবলই দুর্ভাবনা হচ্ছিল—নতুনবৌ একলা রয়েছে বাড়িতে। যদি ভয়ে সে আলো না-নিভিয়ে থাকে? এতক্ষণ হয়ত সিভিল গার্ডের দল গিয়ে বাড়ির সামনে চেঁচাচ্ছে—আলো নিবিয়ে দিন মশাই!

হলধরের দুর্গতি

হালসিবাগানের হলধর হালদার হাড়-কিপটে। পাড়ায় তার হরেক-রকমের দুর্নাম। ভদ্রলোকেরা কেউ বড় একটা তার সঙ্গে কথাই বলেন না। শুধু বেশী সুদ দিয়ে টাকা ধার করতে পিছপাও নয় যারা, হলধর হালদারের বাড়ীতে ছিল তাদেরই যাওয়া-আসা।

গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা কেউ তার নাম করতে চায় না সকালবেলা। বলে, ওর নাম করলে দিনটা নাকি খারাপ যাবে। হলধর হালদারের তাতে কিছু যায় আসে না। তার কথা হ'ল—যে যা বলে বলুক, তাতে ক্ষতি নেই, যদি তার পয়সা খরচ না হয়।

এমনি করে হলধরের দিন বেশ নিরুপদ্রবেই কাটছিল।

কিন্তু চিরদিন তো আর কারুর সমান যায় না। জীবন-যুদ্ধেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। বেধে গেল য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাজার থেকে একে একে সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হতে শুরু হ'ল। চাল নেই, চিনি নেই, কাপড় নেই, কয়লা নেই, সরষের তেল দুর্লভ, বাড়ীভাড়া পাওয়া যায় না। এর উপর আবার ব্ল্যাক-আউটের ঠ্যালায় রাত্রে পথে বেরুনো দায়। বিশেষ ধরণের ল্যরীর ভয়ে পথিকেরা সন্ত্রস্ত!

হলধরের বাড়ীতে চিরদিনই একটিমাত্র আলোর ব্যবস্থা ছিল; 'এ-আর-পি'র ভয় দেখিয়ে সেটিও সে নিবিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একটা খরচও তো কমবে। আটহাতি কাপড় পরেই দিন কাটাতো সে! এবার ধরলে গামছা! হলধরের পত্নী আপত্তি করায় সে বুঝিয়ে দিলে—এ ধুতির দামেই কেনা—দু'টাকা জোড়া! বুঝলে?

কয়লার অভাবে হলধর গুল পাকিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। ঘীয়ের বদলে 'দালদা'র প্রচলন হয়েছিল তার বাড়ীতে লড়াইয়ের আগে থেকেই। সরষের তেল না পেয়ে সে বাদাম তেলেই সন্তুষ্ট ছিল। তার মতে এখন বিনা চিনিতে চা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। চিকিৎসার ব্যাপারে বরাবরই সে পাঁচ পয়সা ড্রামের হোমিওপ্যাথীর পক্ষপাতী, কাজেই ঔষধের অভাবে তাকে কষ্ট পেতে হয় নি। সে শুধু বিব্রত হয়ে পড়েছিল চালের দামটা চড়তে! আগে শুধু একাদশীর দিনটাতেই সে ভাত খেত না। এখন থেকে অমাবস্যা পূর্ণিমাতেও ভাত খাওয়া ছেড়ে দিলে। চালের খরচ যতটা কমে ততটুকুই তার সাশ্রয়।

এইভাবে নানা ফিকির ফন্দি খাটিয়ে হলধর চলেছিল লড়াইয়ের অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে। তবুও খরচ যে বেশী পডছিলই এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না! তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল চেম্বার্লেন-চার্চিলের উপর। আরে বাবা, পোলাণ্ডের ড্যানজিগ করিডর চেয়েছিল ঐ জার্ম্মান গোঁয়ার হিটলার, দিয়ে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যেতো! তোমরা কেন তাই নিয়ে কোমর বেঁধে লড়াই করতে গেলে? পরের ধনে পোদ্দারী করা কেন?

কিন্তু হলধরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন সে শুনলে যে পাড়ার ছেলেরা এই বাজারেও বারোয়ারী পূজোর আয়োজন করছে। সেবার আশ্বিনের আগেই হালসিবাগানের তরুণ-সঙ্ঘ ঠিক করে ফেললে চাঁদা তুলে পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গোৎসব করবে। পাড়ার মতব্বরেরা অনেকেই হিন্দু-মহাসভার পাণ্ডা হিসাবে এতে সায় দিলেন। কেউ কেউ ঢোঁক গিলে বললেন—তাই তো, এই দুঃসময়ে এবার পূজোটা—কিন্তু, শেষ পর্যন্ত চাঁদার খাতায় একে একে সবাইকেই সই করতে হ'ল। ছেলেরা না-ছোড়বান্দা।

চাঁদ যা উঠলো তাতে দেখা গেল যে দুর্গপূজাটা কোনও রকমে সারা

চলবে বটে, কিন্তু নাটক অভিনয়ের জন্য কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। ছেলেরা হতাশ হয়ে পড়লো। কারণ, সার্বজনীন পূজার আয়োজনের মূল প্রেরণাই ছিল তাদের এই নাট্যাভিনয়ের সুযোগ পাওয়া। তা ছাড়া, অন্যান্য পাড়ায় ইতিমধ্যে রটেও গেছে যে 'তরুণ-সঙ্ঘ' এবার 'যুব-সমিতি'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'দেশের ডাক' অভিনয় করবে।

সুতরাং দুর্গাপূজাটা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সেরে নিয়ে নাটক অভিনয়টা করতেই হবে। নইলে ও-পাড়ার ওরা এদের টীটকিরি দেবে যে!

চাঁদার খাতা বগলে নিয়ে আবার একবার বেরিয়ে পড়লো ছেলের দল। যে-সব বাড়ীতে এখনও যাওয়া হয় নি, বেছে বেছে তাদের দরজায় হানা দিলে এবার 'তরুণ-সঙ্ঘে'র উৎসাহী কর্মীরা!

ভোর পাচটা থেকে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে বেলা ন'টা নাগাদ মাত্র দশসের কয়লা নিয়ে হলধর হালদার অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজে সবে মাত্র বাড়ী ঢুকছে, 'তরুণ-সঙ্ঘ' হৈহৈ করে এসে উপস্থিত। চাঁদা চাই!

চাঁদার খাতাখানি ভালো করে নেড়ে চেড়ে, পাতা উল্টে, হিসাব করে দেখে, হলধর বাবু বললেন— পূজোর খরচ তো তোমাদের উঠে গেছে বাবা, তবে আবার উৎপাত করতে এসেছো কেন?

ছেলেরা বুঝিয়ে বলতে গেল—মহাপূজায় কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা তো করতে হবে? তাই, আমরা ঠিক করেছি—পাড়ার ছেলেরা মিলে 'দেশের ডাক' নাটক অভিনয় করবো। এর জন্যে আরও শ'দুই টাকা তুলতে হবে।

হলধর দাঁত মুখ খিচিয়ে বলে উঠলেন—এ বাজারে আর থিয়েটার করতে হবে না! খেতে না-পেয়ে লোকে রাস্তায় পড়ে মরেছে, এ-সময় পূজোর ব্যবস্থা করাও তোমাদের উচিত হয় নি। বাজে পয়সা নষ্ট করার আমি পক্ষপাতি নই।

ছেলেরা ছাড়বার পাত্র নয়! বলে—আপনি কিছু না দিলে উঠবো না।

হলধর ক্ষেপে উঠে বলেন—কাণ ধরে বার করে দেব সব। দোরে দোরে ভিক্ষা করে সঙ সেজে নাচতে লজ্জা করবে না? থিয়েটার করবার সখ হয়ে থাকে—যাদের বাপের পয়সা আছে অপচয় করবার মতো—তারা করুক। তোমরা গরীবের ছেলে, তোমাদের এ ঘোড়ারোগ কেন? নাচ-তামাসার জন্যে চাঁদা দেব? এক পয়সাও পাবে না, যাও, চলে যাও—

ছেলেরা বলে,—চাঁদা না পেলে যাবো না। আমরা সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকবো এখানে।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন তিক্ত হয়ে উঠলো যে হলধর গলাধাক্কা দিয়ে বা কাণধরে তাড়াতে না পেরে—পুলিশ ডেকে এনে তাড়ালেন।

ছেলেরা এ ব্যাপারে নিজেদের অত্যন্ত অপমানিত বোধ কবলে। হলধরকে পাড়া থেকে তাড়াবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো। রোকের মাথায় হলধরকে বাদ দিয়েই তারা আরও কিছু টাকা চাঁদা তুলে ফেললে এবং মহাসমারোহে মহাপূজা, যাত্রা, থিয়েটার, মায় কাঙালীভোজন পর্যন্ত করালে।

হলধর একদিন এসেছিল প্রতিমা দর্শন করে মায়ের প্রসাদ নিয়ে যেতে। ছেলেরা তাকে এমন তাড়া করলে যে বেচারী পালাতে পথ পেলে না। কিন্তু এইখানেই হলধরের লাঞ্ছনা শেষ হয় নি। তাব দুর্গতি শুরু হ'ল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পর।

ছেলেরা যে তাকে পাড়া ছাড়া করবার সংকল্প করেছে হলধর তা জানতো না। ব্যাপারটা সে প্রথম বুঝতে পারলে—যেদিন সকালে উঠে দেখলে—তার বাড়ীর সামনে অসংখ্য ভদ্রলোক এবং ঝী, চাকর, বামুন, মুটে, মজুর কালো কালো কয়লার থলি ও ঝুড়ি প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। ঠ্যালাগাড়ীওয়ালারাও অনেক এসেছে। মাঝে মাঝে চিৎকার শোনা যাচ্ছে—কই মশাই! আপনার ভোর ৬টা যে বেলা ৯টা হবার যোগাড়! আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবেন?

কেউ বলছে—আরে দাঁড়ান মশাই, আগে খিড়কীর দরজা দিয়ে মাল সব পাচার হোক! আপনারা তো আর দেড় টাকার বেশী দেবেন না? তিন-চার টাকা মণের বাঁধা খদ্দেরদের আগে কয়লা পাঠিয়ে তবে তো আপনাদের জন্য দরজা খুলবেন।

আর একজন অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো—কী মশাই! আমাদের ভাগ্যে কি শেষটা শুধু গুঁড়োই জুটবে?

হলধর বিরক্ত ও বিস্মিত হ'য়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—আপনারা আমার বাড়ীর সামনে ভীড করে দাঁড়িযে এত গোলমাল করছেন কেন?

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠ গর্জন করে উঠলো—কয়লা দেবেন কি না বলুন? নইলে থানায় খবর দেবো!

"কয়লা!" হলধরের দুই চোখ কপালে উঠে গেল। বললে—পেলে আমিই নিই মশাই! কয়লা কোথা এখানে? যান কয়লার ডিপোয়। আমি কয়লার ব্যবসা করি নি। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী।

একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক জামার পকেট থেকে একখানা হ্যাণ্ডবিল বার করে বললেন—আপনার নাম কি হলধর হালদার? এই ঠিকানাতেই তো কয়লা পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞাপন বিলিয়েছেন!

হলধর তর তর করে নীচেয় নেমে এসে হ্যাণ্ডবিলখানা টেনে নিয়ে একনিশ্বাসে পড়ে ফেললেন, সত্যই ত! তাঁরই নাম ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপন বিলি হয়েছে—

এখানে কণ্ট্রোলের দর অপেক্ষা সুলভ মূল্যে কয়লা পাইবেন। প্রত্যেক লোককে এক মণ হইতে বিশ মণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। ঠ্যালা-

গাড়ীওয়ালাদের সুবর্ণ সুযোগ! সরকারী চাকুরিয়াদের ধারেও কয়লা সরবরাহ করা হয়।

হলধরের চোখের সামনে যেন ইঞ্জিনের মতো ঘন কালো কয়লার ধোঁয়া পুঞ্জিভূত হয়ে উঠলো! জোড়হাত করে করুণ ভাবে সে বললে—দোহাই মশাইরা! আমি এর কিছুই জানি নি। নিশ্চয় পাড়ার ছেলেরা আমাকে জব্দ করবার জন্য এই চালাকী করেছে। বিশ্বাস না হয়, আপনারা দেখবেন চলুন ভিতরে—আমার ঘরে পূরো পাঁচ সের কয়লাও নেই!

ভদ্রলোকেরা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন বটে। ঠাকুর, চাকর এবং ঝীয়ের দলও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে। কিন্তু, ঠ্যালাগাড়ীওয়ালারা সেকথা বিশ্বাস করলে না। অতি অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে তারা গাড়ী নিয়ে অপ্রসন্ন হয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু হলধরের দুর্ভোগ সেই একদিনেই শেষ হ'ল না। আরও কিছুদিন ধ'রে কয়লার খরিদারদের ভীড় চললো। পরে কলকাতায় কয়লার চালান আসায় এবং দোকানে দোকানে কয়লা সরবরাহ শুরু হওয়ায় হলধর সেযাত্রা রক্ষা পেলেন। কিন্তু সপ্তাহকাল যেতে না যেতেই হলধরের বাড়ীর সামনে আবার ভীড জমে উঠলো। আশেপাশের কৌতূহলী প্রতিবেশীরা বেরিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি? আপনারা কয়লা নিতে এসেছেন বুঝি?

একটি শীর্ণকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে কি কয়লাও পাওয়া যায়? আমরা সরষের তেলের সন্ধানে এসেছি মশাই! এই দেখুন হ্যাণ্ডবিল—খাঁটি সরিষার তৈল—মাত্র ১৲ টাকা সেরে পাইবেন, ভিতরে অনুসন্ধান করুন।

পাডার লোকেরা বললে, ও জোচ্চোর মশাই! দু'টাকা সের দিয়েও

আমরা কোথাও তেল পাচ্ছি নে, ও কোথা থেকে দেবে? নিজে তো খায় বাদাম তেল!

লোকগুলি কিন্তু কেউ নড়ল না। বরং দু'একজন পরস্পরের গা টিপে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—ভীড় কমাবার মতলব। আমাদের বোকা বুঝিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে নিজেরা সব তেলটা কিনে নেবে। তারপর ব্ল্যাক-মার্কেটে বেচবে—বুঝলেন মশাই? ওসব চালাকী আমাদের জানা আছে।

সেদিন প্রায় সারাদিন ধরেই জলস্রোতের মতো জনস্রোত এসে জমতে লাগল হলধরের বাড়ীর সামনে। একদল লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করেন হলধর যতক্ষণে—ততক্ষণে আর একদল লোক এসে জড়ো হয়। বাড়ীর সামনে ভীড়, হল্লা, চিৎকার চলেইছে। কেউ বলে পুলিশে দেবো, কেউ বলে জুয়াচোর, কেউ বলে বদমাইস! এ ছাড়া অশ্রাব্য গালিগালাজও কেউ কেউ এমন শুরু করলে, যে, পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে হলধরের বাড়ী চড়াও হলেন এবং 'হয় তিনি এসব ন্যুইসেন্স বন্ধ করুন, নয় তো এপাড়া ছেড়ে উঠে যান' বলে তাকে 'আল্টিমেটাম' দিলেন।

হলধর এবার সত্যই বিব্রত হয়ে উঠলেন। কারণ সরিষার তৈল সমস্যা মিটতে না মিটতে দেখা গেল দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে হলধরের বাড়ীর সামনে ভীড় ক'রে চেঁচাচ্ছে—কই মশাই! কাগজ দিন! খাতা দিন! স্কুল কলেজের বিল দেখালেই প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে এক রীম করে সাদা কাগজ ও এক ডজন উৎকৃষ্ট রুলটানা 'এক্সেরসাইজ বুক' দেওয়া হবে বলে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাই দেখে আমরা এসেছি।

হলধর অভিভাবকদের বুঝিয়ে ফেরাতে পেরেছিলেন, কিন্তু, মুস্কিলে পড়লেন এই ছেলেদের নিয়ে! তারা কিছুতেই বুঝবে না; প্রথমটা—

'দিন সার', 'আপনার পায়ে পড়ি সার', 'শুধু আমাকে দিলেই হবে', 'আমি কাউকে বলবো না', 'চুপি চুপি লুকিয়ে নিয়ে চলে যাবো' ইত্যাদি সবিনয় কাকুতি মিনতি চললো। কিন্তু, তাতে যখন কোনও ফল হ'ল না দেখা গেল, তখন ছেলের দল নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে। চিৎকার —হল্লা—হৈ হৈ—তো চলছিলই, এবার তার সঙ্গে শুরু হল হলধরের বাড়ীর জানালা দরজা লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া! ঝন ঝন করে সার্শির কাঁচ ভেঙে পড়তে লাগল। ফটাফট্ শব্দে খড়খড়ির পাখী ফাটতে শুরু হ'ল। হলধরের বুকের পাঁজরা খসে যেতে লাগল।

এবারও পুলিশের সাহায্য নিয়ে হলধর এই বালকবাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

কিছুদিন সব চুপচাপ। হলধর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবলেন আপদের শান্তি হ'ল।

কিন্তু হ'ল না। কপালে দুঃখ তাঁর আরও কিছু ছিল।

পয়লা জনুয়ারী থেকে দেখা গেল প্রতি পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর কেউ না কেউ এসে হলধরের বাড়ীর কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করছে—"বাড়ীতে কে আছেন মশাই?"

প্রতিবারই হলধর বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। জিজ্ঞাসা করেন কি চাই?

তাঁরা বলেন,—বাড়ীখানি একবার দেখবো। বেডরুম পাঁচখানা কি সমান সাইজের? দোতলার কলে জল ওঠে? ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে তো?

হলধর রেগে উঠে বলেন,—আমার বাড়ীতে কি আছে না আছে সে খোঁজে আপনাদের কি দরকার?

তাঁরা বলেন, বিলক্ষণ! বাড়ী ভাড়া দেবেন বলে খবরের কাগজে

বিজ্ঞাপন দিয়েছেন! তাইতো আমরা খোঁজ নিতে এসেছি।

হলধর বলেন—আজ্ঞে না। এ আমার নিজের থাকবার বাড়ী। আমি ভাড়া দেব না।”

একজন বললেন—তবে বিক্রী করুন!

হলধর বলেন—আমার এমন কিছু টাকার অভাব হয় নি যে বসত-বাড়ী বিক্রী করতে যাবো!

তৃতীয় লোক বললে—ওসব কথা ছেড়ে দিন মশাই! আপনি আমাকে ৩০ বছরের জন্য বাড়ীটা 'লীজ' দিন। বেশ মোটা টাকা সেলামী দেবো।

হলধর বলেন—আমি কিছুই করবো না।

তাঁরা বলেন—করতেই হবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যখন—

হলধর বলেন—আমি দিইনি মশাই, ও আমার শত্রুপক্ষর কাজ।

তাঁরা বলেন—দশ-পনরো টাকা ইঞ্চি দরে, এই বাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে কার দায় পড়েছে মশাই আপনার সঙ্গে এ রসিকতা করতে যাবে?

হলধর তখন সব কথা তাঁদের খুলে বলেন। কয়লার বিজ্ঞাপন দেখান, সরষের তেলের হ্যাণ্ডবিল বার করেন। ভদ্রলোকেরা দেখে শুনে হাসতে হাসতে চলে যান।

কিন্তু, মুস্কিল বাধলো পরের সপ্তাহের জনতা সামলাতে! মিহি কাপড়ের দলকে সকালে যদিই বা ঠেকানো গেল, কিন্তু, তেল কেরোসিনের ভিড়কে আর কিছুতেই রোকা গেল না! কারণ, দুপুর থেকে ক্রমাগত লবণের চাহিদা মেটাতে মেটাতেই হলধরের জীবন লবণাক্ত হয়ে উঠেছিলো! বিকেলের ভীড়ে তো শুধু ঝী, চাকর, ঠাকুর বামুন নয়, মুটে মজুর, কুলি কামার, মেথর মুদ্দোফরাস, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, মুচী মিস্ত্রী, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি

ছত্রিশ জাতের লোক জড় হয়েছে—যেন 'অল ইণ্ডিয়া অন্‌টাচেব্‌ল কনফারেন্স' !

এবারকার কেলাহলে বেশীরভাগই হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষার প্রাবাল্য দেখা গেল! অনেকটা কমিউনিস্ট্ কমরেডদের গোলোযোগের সঙ্গে যেন পাকিস্থানী হল্লা মিশ্রিত! একেবারে জনযুদ্ধের ব্যাপার! রীতিমতো গণআন্দোলনের উত্তেজনা! গ্যাড়াতলার প্রচলিত গালাগালির সঙ্গে মাঝে মাঝে 'জয়হিন্দ্' 'ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ' ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। হলধরের কোনও কৈফিয়ৎই তারা শুনতে চায় না! তাদের মুখে শুধু এক বুলি—কেরোসিন লে-আও শালা! নিমক নিকালো নিমক-হারাম! আরও যে সব সম্বোধনে হলধরকে তারা আপ্যায়িত করছিল—তাকে ঠিক অভিনন্দন বলা চলে না!

রাত্রি ৯টা-১০টা নাগাদ তারা পাতলা হয়ে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে হলধরকে শাসিয়ে গেল—রাস্তায় বেরুলেই মারবে। কেউ কেউ বলে গেল—তাকে রাস্তায় পেলে খুন ক'রে ফেলবে!

হলধর এবার রীতিমতো ভীত ও চিন্তিত হয়ে উঠলো। হলধরের স্ত্রী বললেন,—চলো, না হয় দিনকতক কাশীতে ঘুরে আসি। কাশীতে মামার বাড়ী গিয়ে থাকবো। কোনও খরচ লাগবে না। এসব গুণ্ডাদের রাগ পড়লে, তখন ফিরে আসা যাবে।

হলধর নিমরাজি হয়ে গেল বটে, কিন্তু, ট্রেনভাড়ার খরচটা হিসাব করে তার বুকটা কর কর করছিল। কিন্তু, ভগবান যখন মুখ তুলে চান তখন সকল দিক দিয়েই স্থবিধা হয়ে যায়! সেইদিনই সন্ধ্যার পর মস্ত এক মোটরে চড়ে এক ভদ্রলোক এলেন হলধরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিছুদিন আগে তিনি সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন যে এই বাড়ীটি ভাড়া, লীজ দেওয়া বা বিক্রয় করা হবে। বাড়ীখানি যদি খালি থাকে ভদ্রলোক ভাড়া নিতে চান। সারা কলকাতা শহর ঘুরে তিনি

কোথাও একখানি বাড়ী পাচ্ছেন না। ভাড়া যা লাগে দিতে রাজি আছেন। তিনমাসের ভাড়া আগাম জমা দিতেও প্রস্তুত।

"জয় বাবা বিশ্বনাথ—কাশীনাথ! একেই বলে বিশ্বেশ্বর টেনেছেন!" মনে মনে কাশীশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে হলধর ভদ্রলেকের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে অনেকক্ষণ কী পরামর্শ করলেন।

ভদ্রলোক পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার করে বার বার মুখ মুছতে থাকন, দামী এসেন্সের গন্ধে ঘর ভরে ওঠে। ভদ্রলোকের হাতের মস্ত হীরার আংটিটাও সঙ্গে সঙ্গে বিজলীবাতির আলোয় ঝক্‌মক্ করে। হলধর ভাবেন, বাবার কৃপায় আজ ধনপতি কুবের এসেছেন তাঁর দ্বারে।

নগদ তিনশ' টাকার তিনখানা নোট হলধরের হাতে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক হাতঘড়ির দিকে চাইলেন। সোণার ঘড়ি, সোণার ব্যাণ্ড! কাশ্মিরী কাজ-করা রূপোর সিগারেট কেস থেকে একটি গোল্ডটিপ সিগারেট বার করে মুখে দিয়ে কেসটি হলধরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আসুন।

হলধর সিগারেট খান না। বিড়ি খেতেন—মাঝে মাঝে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে দর চড়ে যেতে তাও ছেড়ে দিয়েছেন। গোল্ডটিপ সিগারেট দেখে আর লোভ সামলাতে পারলেন না। সাগ্রহে একটি তুলে নিলেন।

"আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান। মাসে মাসে কাশীর ঠিকানায় আপনার ভাড়া পয়লা তারিখেই পৌঁছবে।" বলে' ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

হলধর বললে,—আপনার রসীদখানা—ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন,—কিচ্ছু দরকার নেই। আপনার মতো লোককে যদি বিশ্বাস না করি তবে যে সংসারে চলা দায় হয়ে উঠবে দাদা।

হলধর খুশী হয়ে ভদ্রলোককে মোটর গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক ভিতরে উঠে বসে গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়া বললেন,—কাল তা হ'লে সন্ধ্যা সাতটায় গাড়ী আসবে আপনাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে। জিনিসপত্র যা যাবার বেঁধে ছেঁদে রাখবেন। বেলা চারটে নাগাদ আমার দ্বারবান এসে ঠ্যালা গাড়ী করে সব নিয়ে গিয়ে হাওড়া স্টেশনে সব বুক করে দেবে। আপনাদের টিকিট আমিই করে রাখবো। যা কিছু রেখে যাবার দোতলার একখানি ঘরে চাবী দিয়ে রেখে যাবেন।

হলধর আহ্লাদে গদ গদ হয়ে 'যে-আজ্ঞা' বলে এক সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন ভদ্রলোককে।

এই ঘটনার দিনআষ্টেক পরে পাড়ার লোকেরা দেখলে একজন নূতন ভদ্রলোক এঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি, কণ্ট্র্যাকটার প্রভৃতি নিয়ে হলধরের বাড়ী মাপ-জোক করছেন। জনকতক কৌতূহলী মাতব্বর এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপর কি মশায়? হলধরবাবুর বাড়ী কি আপনি—

ভদ্রলোক তাঁদের কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই কিনিছি। কিন্তু এ বাড়ীর প্ল্যানটা অতি বিশ্রী নয় কি? আমি এ বাড়ী ভেঙ্গে সমভূমি ক'রে নূতন প্ল্যানে আর মডার্ণ ডিজাইনে অর্থাৎ লেটেস্ট স্টাইলে বাডী তৈরি করবো।

পাডার লোকেরা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, মাসচারেক পরে হলধরবাবু কাশীতে বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। প্রতিমাসের পয়লা তারিখে অগ্রিম ভাড়া পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু, চারমাস কেটে গেল কোনও খবরই নেই। হলধর দু'খানি চিঠি দিয়ে কোনও উত্তর পায় নি। আরও দু'মাস উদ্বেগে কাটলো। হলধর টেলিগ্রাম করেও কোনও সাড়া পেলেন না।

হলধরের অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী প্রস্তাব করলেন,—ছ'মাস তো

এখানে কেটে গেল। এইবার বাড়ী ফেরা যাক চলো। এত দিনে সেখানকার গোলমাল নিশ্চয় মিটে গেছে।

হলধর ফেরবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সেই রাত্রেই তিনি সস্ত্রীক কলকাতায় রওনা হলেন।

হাওড়া স্টেশনে নেমে একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীর চালে মোট ঘাট তুলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে হালসিবাগান লেনে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু যেখানে তাঁর বাড়ী ছিল—সেখানে দেখলেন কোনও ইমারত নেই! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাঠ! ছেলেরা সেখানে বল খেলছে!

লাজুক

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু লাজুক। যে ঘরে একঘর লোক থাকতো, আমি কিছুতেই সে ঘরে ঢুকতে পারতুম না। অচেনাদের কাছ থেকে পালিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতুম। যদি কখনও বাধ্য হয়ে কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করতে হোত, তা'হলে আমি কেমন জড়সড় ভাবে তার সামনে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতুম। আমায় কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি চট কোরে কোনও জবাব দিতে পারতুম না! খানিকটা মাথা চুলকুতুম, কোঁচার খুঁটটা দাঁতে কোরে চিবুতুম। বড় হোয়েও এ দোষ গেলনা। তাই, আমার আত্মীয় পরিজনের কাছে 'লাজুক' বলে আমার একটা দুর্নাম রটে গেল।

ইস্কুলে গিয়ে চুপটি কোরে বেঞ্চের এক কোণে বসে থাকতুম। কারুর সঙ্গেই কথা কইতুম না। মাষ্টার পড়া জিজ্ঞাসা করলে প্রথমটা লজ্জায় বলতে পারতুম না। মাথাটি নিচু কোরে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতুম। পরে

ধমক খেয়ে বলে ফেলতুম। ছেলেরা নাম জিজ্ঞাসা করলে, পেন্সিলটা মুখের ভিতর পুরে ক্রমাগত চিবুতুম, আর হেঁট হয়ে বসে থাকতুম। আমার কাণ দু'টো সিঁদুরের মত লাল টকটকে হয়ে উঠতো! কিন্তু কিছুতেই আর নামটা তাদের বলে উঠতে পারতুম না! ইস্কুলের ছেলেরা শেষে আমার নাম রাখলে 'লজ্জাবতী লতা!'

চোখের সামনে দেখতুম আমার সমবয়সীরা কেমন হেসে খেলে সকলের সঙ্গে মিশে আমোদ কোবে কাটাচ্ছে। আমি কিন্তু কিছুতেই কারুর সঙ্গে মিশতে পারতুম না! এই জন্যে আমার নিজেরই উপর এক এক সময়ে ঘেন্না ধরে যেত!

আমার বাবা বড়লোক, জমীদার। আমরা পল্লীগ্রামে থাকি বটে; কিন্তু, আমাদের মোটর গাড়ী আছে। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হবার আগেই ধূমধাম করে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন আমি লজ্জায় আর কারুর দিকে চাইতে পারিনি! সমস্তক্ষণ চোখ বুজিয়ে-ছিলুম। আমার অসুখ করেছে মনে করে বাসর ঘরে আমাকে আর কেউ জ্বালাতন করেনি। বাবাও বলে দিয়ে এসেছিলেন যে আমাকে যেন ঘুমোতে দেওয়া হয়। কেউ যেন না বিরক্ত করে।—সেইজন্যে বেঁচে গেলুম, বেশী ভুগতে হয় নি।

সকালে বাবা এসে আমাকে আর বউকে নিয়ে বাড়ী চলে এলেন। লজ্জায় আমি একবারও বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখিনি। দুপুরবেলা একবার চুপিচুপি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দূর থেকে লুকিয়ে বউকে দেখেছিলুম—দিব্যি ছোট খাটো একফোঁটা মেয়েটি! দেখলেই শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী বলে মনে হয়। কপালে টিপ, নাকে একটা নোলোক দুলছে। মুখে হাসি লেগে রয়েছে। বেশ কালো টানা ডাগর চোখ দুটি, রংটি ধবধবে ফর্সা। বউকে দেখে আমার খুব পছন্দ হোল! কিন্তু তাকে

মোটেই আমার মত লাজুক বোলে মনে হোল না। বেশ আমার বোনেদের সঙ্গে পুতুল খেলা শুরু করে দিয়েছে দেখলুম।

আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে আসছি, দিদিমা ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে! বউ পছন্দ হয়েছে তো সুরো?

বয়স আমার তখন ষোল বছর! দিদিমার প্রশ্ন শুনে লজ্জায় আমি ছুটে বাইরের ঘরে পালিয়ে গেলুম।

দিন দুই পরে আমাদের বাড়ীতে 'বউ ভাত'। অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ খেতে আসবেন শুনলুম। সকাল থেকে তার আয়োজন চলছিল। আমি ত ব্যাপার দেখে সন্ধ্যের আগেই বাড়ী থেকে পালিয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে বসে রইলুম। অনেক রাত্রে বুড়ো রামচরণ দরওয়ান আর আমাদের কৃষ্ণ সরকার এসে আমাকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল। আমি তখন গোলদীঘির একখানা বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বাবা খুব বকলেন। মা বললেন—এত বড় ছেলে হলি, এখনও তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হোল না! আমি আর কথাটি না কয়ে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে দিদিমার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

দিদিমা বললেন—আর আমার কাছে কেন ভাই, বউ এসেছে, যাও তোমার বউয়ের কাছে গিয়ে শোওগে।

দিদিমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম—ফের যদি তুমি ও সব কথা বোলবে তো এখুনি আমি কিন্তু গোলদীঘিতে পালিয়ে যাবো!

যেদিন সকালবেলা বউ তাদের নিজেদের বাড়ী ফিরে গেল তার সাত আট দিন পরে একদিন শুনলুম আজ নাকি আমাকে শ্বশুরবাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে! শুনেই তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে যাবার জোগাড়! কী সর্বনাশ! সেই তাদের বাড়ীতে আবার যেতে

হবে? সেই খানেই আমাকে খেতে হবে? কী মুস্কিল! শুনেছি বটে আমার বউয়ের দু' তিনজন দাদা আছেন, চার পাঁচ জন দিদি আছেন, কিন্তু তাঁদের কারুর সঙ্গে তো আমার আলাপ পরিচয় নেই! সেখানে গেলেই তো তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হবে! সেইটেই যে আমার পক্ষে মস্ত-বিপদের কথা!

আমি তো কিছুতেই যেতে রাজী হ'লুম না। কিন্তু, আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে মা নিজে আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বিকেলে মোটরে করে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

জরী পেড়ে কোঁচান ধুতি পরে, পাম্‌সু জুতো পায়ে দিয়ে, সিল্কের জামা গায়ে দিয়ে, বেনারসী চাদর উড়িয়ে, হাতে সোণার ঘড়ী বেঁধে, হীরের আংটী পরে, আতর মেখে, রুমালে এসেন্স লাগিয়ে, শ্বশুর বাড়ী যাবার সময়ে মনে বেশ একটা স্ফূর্তি হয়েছিল। দূর থেকে শ্বশুর বাড়ীটা কিন্তু নজরে পড়তেই বুকটা ঢিব্-ঢিব্ করে উঠলো! আর একটু পরেই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নামতে হবে মনে হতেই সব স্ফূর্তি আমার কোথায় উবে গেল!

ক্রমাগত মনে মনে একটা দুর্ভাবনা হ'তে লাগল—তাইত! ওদের বাড়ী যদি মেলাই অচেনা লোকজন এসে থাকে, তা' হলে তো আমায় বড় ফেসাদে পড়তে 'হবে! এঃ। নিমন্ত্রণে না এলেই ভাল হোত! কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। কেননা, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য যে লোক এসেছিল সেও আমার সঙ্গে মোটর গাড়ীতে যাচ্ছিল।

গাড়ী শ্বশুরবাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই আমার সঙ্গের লোকটি আমাকে খাতির করে নামিয়ে নিয়ে গেল! বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যে-ঘরে প্রথম গেলুম সেখানে একজন দাড়িওয়ালা গম্ভীর লোক

একটা টেবিলে বসে কি লিখছিলেন ; আমার সঙ্গের লোকটি আমাকে দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—এই নিন আপনার জামাই সুরেনকে ধরে এনেছি! যে লাজুক, কিছুতেই আসতে চায় না! ওর বাপ-মা জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন! আন্দাজে বুঝলুম ইনিই বোধ হয় আমার শ্বশুর, তারপর ঘরের আশে-পাশে চারিদিকে চোরের মত চেয়ে একবার দেখলাম সে ঘরে আর কেউ আছে কিনা? আর কেউ নেই দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাছে এগিয়ে গিয়ে ভব্যিযুক্ত হয়ে তাঁকে এক ভূমিষ্ঠ প্রণাম ; তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এস বাবা এস, বোস, বোস, বেশ ভাল আছ তো?

আমি আর লজ্জায় কোনও জবাব দিতে না পেরে টেবিলের কাছে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে চিরকালের অভ্যাস মত মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগলুম! শ্বশুরমশাই তিন চারবার বসতে বলায় তখন আর কিছু না-বলা নিতান্ত খারাপ দেখায় দেখে, প্রাণপণ চেষ্টায় বলে ফেললুম— "থাক্ থাক্, ব্যস্ত হবেন না, আমি বস্‌ছি, আপনি লিখুন না!"

শ্বশুর মশাই আবার লিখতে বস্‌লেন। ভদ্রতার খাতিরে আমাকে একবার বললেন যে—এগুলো ভারী দরকারী চিঠি, আজ রাত্রের ডাকেই পাঠাতে হবে।

তিনি লিখতে লাগলেন। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপরে এটা-ওটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলুম! বাড়ীর ভিতর থেকে অনেক লোকের চাপা-গলার আওয়াজ আর হাসির শব্দ আমার কাণে এসে আমাকে বেজায় দমিয়ে দিচ্ছিল। আমার কেবলি ভাবনা হচ্ছিল যে আমায় যদি বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যেতে চায় তা'হোলেই তো গেছি! অত লোকের সামনে কি করে যাবো? সে তো আমার দ্বারা কিছুতেই হবে-না! ইতিমধ্যে শ্বশুর মশায়ের চিঠি

লেখা শেষ হোয়ে গেল। তিনি চিঠিখানা ছাপ বার জন্য ব্লটিং কাগজ খুঁজছেন দেখে আমি তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাড়াতাড়ি ব্লটিং কাগজখানা টেনে নিয়ে যেই তাঁকে দিতে যাব অমনি কালির দোয়াতটা উল্টে পড়ে টেবিলের উপরে কালির ছড়াছড়ি!

ব্লটিং কাগজখানা দিতে গিয়ে আমি আর অত দেখিনি যে তার উপরেই দোয়াতটা বসানো আছে! চিঠিখানা তো নষ্ট হোলই—তার উপর নতুন পালিশ করা টেবিলের গা গড়িয়ে টস্ টস্ করে কালো কালি তাঁর চক্চকে পাথর বসানো পরিষ্কার মেঝের উপর পড়তে লাগল।

নিজের কীর্তি দেখে আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল লজ্জায় একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাই! ছি! ছি!—আমার এই অসভ্যতার প্রতিকার করবার জন্য তাড়াতাড়ি পকেট থেকে আমার সিল্কের রুমালখানা বার কোরে টেবিলের উপর থেকে কালিটা মুছতে আরম্ভ করলুম! শ্বশুর মশাই কালি পড়তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। তিনি আমার কাণ্ড দেখে এগিয়ে এসে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে একখানা ময়লা ঝাড়ন নিয়ে কালিটা মুছে ফেললেন! তারপর, আমাকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে মহা মুস্কিলে ফেল্লেন! তার চেয়ে তিনি যদি আমাকে ঘা-কতক মার দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতেন, তা' হলে আমি বোধ হয় বেঁচে যেতুম!

বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমি যে কি করবো কিছুই ঠিক করতে পারলুম না! এক পাশে সঙের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! যার সঙ্গেই চোখোচোখি হচ্ছে তাকেই একটু নীচু হয়ে একটা নমস্কার ঠুক্‌ছি! আর ভাবছি যে—আমার বাদামী রংয়ের সিল্কের জামাটায় যে প্রকাণ্ড কালির দাগটা লেগেছে সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না

তো! আমার বৌয়ের দিদিরা এসে আমাকে খাতির করে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতর বসালেন। ছেলেতে মেয়েতে প্রায় একঘর লোক আমায় ঘিরে বস্‌ল। কত কথাই সব আমাকে জিজ্ঞেসা করতে লাগল! আমি ঘাড় হেঁট করে মাটীর দিকে চেয়ে "হ্যাঁ" "না" বলে যতদূর পারি জবাব সারতে লাগলুম। লজ্জায় আমার মুখ চোখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠতে লাগল!

কেউ বল্‌ছে—ওরে খুকীকে এখানে নিয়ে আয়, নইলে সুরেন কথা কইবে না। কেউ বল্‌ছে—জামাইবাবু! একটা রবি ঠাকুরের গান শোনান না—হারমোনিয়ামটা এনে দেব? কেউ বল্‌ছে—আপনি কি বোবা? একটা গল্প বলুন না শুনি! শেষ একটা প্রস্তাব উঠলো—খেতে-দেতে তো দেরী হবে, আসুন ততক্ষণ আমরা একটু তাস খেলি! —কেমন? এতে রাজী আছেন কি? আমি এইটেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

তখনি একজোড়া তাস এসে পড়ল। সবাই বলে 'আমি আপনার সঙ্গে বসব!' সে এক বিপদ। শেষ একটা আপোষে মিট্‌মাট্ হয়ে গিয়ে তাস খেলা শুরু হল; আমি শুধু একবার সবিনয়ে জানিয়ে দিলুম যে আমি তাস খেলা ভাল জানিনে। খেলাতেও সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। যখন তিনখানা ছক্কা আর দু'খানা পঞ্জা খেয়ে ব্যোম্ হারি-হারি হয়েছি তখন শ্বাশুড়ী এসে বল্‌লেন—"রাত হয়েছে বাবা, আজ থাক, উঠে এসো—তোমার খাবার দিয়েছে।" তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে শ্বাশুড়ীকে যেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গেছি—অমনি আমার বেনারসী চাদরের খুঁটে পা আট্‌কে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলুম একেবারে জলচৌকীতে বসানো জলন্ত প্রদীপ-পিল্‌সুজের উপরে। একটা বিশ্রী শব্দ হয়ে প্রদীপ-পিল্‌সুজ্ জলচৌকীর উপর হতে পড়ে গেল। ঘর শুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠল! ভাগ্যে

প্রদীপটা পড়েই নিভে গেল—নইলে সেখানে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেত! ছেলেমেয়েদের দল হৈ হৈ করতে করতে আমার পিছু পিছু আসতে লাগল! একে পড়ে গিয়ে লজ্জায় আমার বুকটা একেবারে দমে গিয়েছিল, তার উপর বৌয়ের ভাই-বোনেরা বলতে লাগল, "আহা, লাগেনি তো!" "কি করে পড়ে গেলেন?" একজন বললে, "কিছু নেশা করেছেন বুঝি?" আর একজন বললে, "অত ছক্কা পঞ্জা খেয়ে বেচারীর মাথা ঘুরে গেছে আর কি!" আমি আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না মনে করে এই হঠাৎ পড়ে যাওয়ার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত ভেবে বলে ফেল্লুম—"ভূমিকম্প হয়েছিল বোধ হয়! নইলে প্রদীপ-পিল্‌সুজটা পর্যন্ত পড়বে কেন?" আমার কথা শুনে চারিদিকে হাসির ধুম পড়ে গেল! শ্বাশুড়ী তাদের ধম্‌কে উঠলেন।

আমি তখন খুব সাবধানে আমার কোঁচান কালা পেড়ে কাপড়ের যেখানে প্রদীপের সমস্ত তেলটা পড়েছিল, সেখানটা গুটিয়ে-সুটিয়ে কোঁচাটা পকেটে পুরে ফেলে লুকোবার ব্যবস্থা করলুম! কিন্তু বাইরের ঘরে আমার সিল্কের জামার ওপরে যে কালির দাগটা লেগে-ছিল—সেইটে এতক্ষণ বেনারসী চাদরখানায় ঢেকে রেখেছিলুম; এখন চাদরখানা ছিঁড়ে যাওয়ায় তার ফাঁক দিয়ে কিন্তু সেটা বড্ড দেখা যাচ্ছিল! খেতে বসে নজরে পড়লো ও-ঘরে আছাড় খাবার সময়ে আমার হাতের হাত-ঘড়ির কাঁচখানাও ভেঙে গেছে!—কি ভাগ্যি! কোথাও কেটে-কুটে যায় নি! কিন্তু, মস্ত ভাবনা হোলো যে—ঘড়িটা যদি ওরা দেখতে পায় যে কাঁচভাঙা—তা' হলে, হয়তো মনে করবে নতুন জামাই ভাঙা ঘড়ি হাতে বেঁধে এসেছে—কি করি? জামার হাতাটা যথাসাধ্য

টেনে টেনে হাত-ঘড়িটা চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দারুণ লজ্জায় তখন আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েচে!

শ্বাশুড়ী আমার সামনে বসে একখানা পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলেন। মেয়েছেলের দল আমার চারদিকে ঘিরে বসে—এটা খান্, ওটা খান্—করতে লাগল। আমার কি ছাই তখন আর ক্ষিদে তেষ্টা আছে? কোনও রকমে সেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজানো থালার ভিতর থেকে অতটা আর না-দেখে একটা বাটী টেনে নিতেই সকলে 'হাঁ হাঁ' করে উঠলো!—"ওটা আগে খাবেন না, ওটা ক্ষীরের পায়েস্ যে। আগে তরকারী দিয়ে খান্!

আবার অপ্রস্তুত হতে হল—'তাই নাকি?' 'ওঃ! বটেইত', 'অতটা দেখিনি' বলতে বলতে আমি আবার আর একটা বাটী টেনে নিয়ে পাতে ঢাল্‌তে যাচ্ছি—সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলো—"আহাহা করেন কি? ওটা আমলকীর চাট্‌নী যে! আপনি কি মেড়ো, যে আগেই চাট্‌নী খেতে শুরু করলেন?" আমি তো লজ্জায় একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। তখন আবার ব্যথার উপর বিষ-ফোড়ার মত বেশ বুঝ্‌তে পারছিলুম যে সেই প্রদীপের তেলটা কোঁচার থেকে আমার পকেটটা শুদ্ধ ভিজিয়ে আমার গায়ে এসে চট্ চট্ করে লাগ্‌চে! হয়তো বা পকেটের পাশ দিয়ে তেল গড়াচ্ছে! আমি কিন্তু লজ্জায় ভয়ে সেদিকে আর চেয়ে দেখতে পারছিলুম না! পাছে দেখতে গেলে ওদের শুদ্ধ সেদিকে নজর পড়ে যায়!

শ্বাশুড়ীর পাখা নিয়ে বাতাস করা সত্ত্বেও আমি কুল্ কুল্ করে ঘেমে উঠেছিলুম! শেষ বাধ্য হয়ে আমি খেতে-খেতেই বাঁ-হাতে পকেট থেকে আমার সিল্কের রুমালটা বার করে নিয়ে মুখের ঘামটা বেশ করে মুছে ফেললুম! কিন্তু এই ঘাম-মোছাই আমার কাল হোল! বাইরের ঘরে টেবিলের উপর কালি ফেলে যে এই রুমালখানা দিয়েই

সেটা মুছে নিয়েছিলুম, সে-কথা মোটেই মনে ছিল না। সুতরাং মুখ মুছে রুমালখানি নামাতেই ঘরের ভিতর হঠাৎ একটা তুবড়ীর মতো হাসির ফোয়ারা উঠে গেল।

আমি তো প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলুম! বুঝতেই পারিনি যে কেন এরা আমার দিকে চেয়ে এত হাস্‌ছে? আমি ভাবছি—প্রদীপের তেলে ভেজা কোঁচাটা দেখতে পেলে নাকি? তারপরেই চট্ করে মনে পড়ে গেল কালি মাখা রুমালখানার কথা! সর্বনাশ! আমার সাম্‌নে যে আর্শীখানা টাঙানো ছিল, মুখ তুলে সেইদিকে চেয়ে দেখি—ছিঃ! ছিঃ! একেবারে ভূত সেজেছি যে! মুখময় কালিতে কালি!

তড়াক্ করে আসন থেকে লাফিয়ে উঠে মুখটা ধোবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে পা পড়ে গেল পাতের সামনে সাজানো আম-ছাড়ানো রেকাবীখানার উপর! সঙ্গে সঙ্গে অম্‌নি পা-হড়্‌কে দড়াম্ করে মুখ থুব্‌ড়ে আছাড়! এবার এমন বে-টক্কর লেগে গেল যে আমি একেবারে অজ্ঞান! ছেলে-মেয়েগুলির হাসি আধখানি বেরিয়েই থেমে গেল! শ্বাশুড়ী চীৎকার করে উঠলেন—"ওগো, শীগ্‌গির একজন ডাক্তার ডাক, জামাই বড্ড পড়ে গেছে।"

তারপর আর আমার কিছু মনে নেই—

বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়

প্রথম দিন

পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটে গিন্নীকে বিশুর মা বলছিল—বিশু যে আমার আজও প্রাণে বেঁচে আছে দিদি—এ শুধু বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়! নইলে—ও ছেলে কি আমার এতদিন থাকতো?

পাশের বাড়ীর গিন্নী বিশুকে ভালরকমই জানেন। এ বাড়ীতে তাঁরা আসবার দু'একদিনের মধ্যেই বিশু এসে আলাপ পরিচয় ক'রে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে গেছে। তারপর থেকে যখন তখন সে একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে উৎপাত শুরু করে দেয়। বলে—মাসি! কি রাঁধছ? দাও না একটু চেখে দেখি!

দিব্যি গাঁট্টা-গোটা বজ্র-বাঁটুল ছেলে। বয়স প্রায় চৌদ্দ-পনেরো হবে। লোহার ভাঁটার মতো অটুট স্বাস্থ্য। এ হেন ছেলে যে কি কারণে বেঁচে থাকতে পারে না—সেটা পাশের বাড়ীর গিন্নী কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে না-পেরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কেন বোন তুমি অমন সব অলক্ষণে কথা বলছো? ষাট্! ষাট্! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিশু তোমার অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক। বলতে নেই, ভগবানের দয়ায় ছেলেত তোমার রুগ্ন নয় ভাই!

বিশুর মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—ঐ যা বললে দিদি! 'ভগবানের দয়ায়!' ভগবানের দয়া না হ'লে কি ছেলে আমার পাঁচ পাঁচবার মরে বাঁচে?

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে অবাক! চোখ দুটি তাঁর বিস্ময়ে

একেবারে গোল হ'য়ে কপালে উঠে পড়লো। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—ওমা কী হবে! তুমি বলো কি দিদি? পাঁচ পাঁচবার! আহা! মরে যাই গো! বাছার আমার কী হয়েছিল বলো তো? ছেলেবেলায় বুঝি টাইফয়েড্—

—শত্রুর টাইফয়েড হোক!

বিশুর মা একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

পাশের বাড়ীর গিন্নী একটু থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বললেন—তবে বুঝি ওলাউঠো—কলেরার মতো কিছু?

বাধা দিয়ে বিশুর মা গর্জন করে উঠলো—যমের ওলাউঠো ধরুক! আমার ছেলের কেন হ'তে যাবে? তোমার এসব কি কথা বাছা! মুখের কি একটু রাখ-ঢাক্ নেই?

অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে পাশের বাড়ীর গিন্নী বললেন—সেত বটেই। আমারই ভুল হয়েছে ভাই! ওলাউঠোয় মানুষের দেহ একেবারে ছেঁচে দিয়ে যায়! তা বলতে নেই, বিশুর আমাদের শরীর তো তেমন—

কথা শেষ হবার আগেই বিশুর মা রুখে উঠলো—দেখ বাছা, ছেলের আমার শরীর নিয়ে খুঁড়ো না। আজ শনিবার—এটাও কি তোমার খেয়াল নেই? তুমি কেমনতর মেয়েমানুষ গা? বলে—কতো ঘী দুধ খাইয়ে বিশুকে আমার মানুষ করেছি। তোমাদের মতো পাঁচজনের নজরে নজরে ছেলে আমার আধখানা হয়ে গেছে!

বিশুর মা'র একথা শুনে পাশের বাড়ীর গিন্নী নিজেকে একটু অপমানিত বোধ করলেন। চটে উঠে মনে মনে বললেন 'ওই যদি ওঁর ছেলের আধখানা চেহারা হয়, পুরো চেহারা না জানি কি ছিল! প্রকাশ্যে একটু সলজ্জ হেসে বললেন—না বোন, না, আমি তা' বলিনি। তোমার ছেলে আমার ছেলে কি আর ভিন্ন? আমি কি ভাই বিশুধনকে

খুড়তে পারি ? পাঁচ-পাঁচবার মরে বেঁচেছে বলছিলে, তাই ভাবছিলুম বুঝি শক্ত কিছু ব্যামোয় ধরেছিল বাছাকে ? এই যেমন ধরো নিউমোনিয়া —ডিপথিরীয়া—প্লেগ—

—ষাট্ ! ষাট্ ! তুমি কি সর্বনেশে মেয়ে গো ! যত বিদখুটে ব্যায়রাম জিভের আগায় জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ ? তোমার মত মারাত্মক জীব পাশে থাকতে কি ছেলে আমার বাঁচবে—?

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার যথার্থই রেগে উঠলেন। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে রীতিমতো বিরক্তি ফুটে উঠল। অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন—এতদিন যদি বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় ছেলে তোমার পাঁচবার মরেও বেঁচে থাকতে পারে তাহলে—

পাশের বাড়ীর গিন্নীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশুর মা বললে—সেই কথাই তো তোমায় বলতে যাচ্ছিলুম দিদি ! তা তুমি শুনলে কই ?—যত অলুক্ষণে রোগের নাম করতে শুরু করলে ! বলতে নেই, বাবার দয়ায় বিশু আমার অসুখ বলে কখনো কিছু জানে না। সেই যা ছোটবেলায় টিকে হবার আগে একবার হাম নাট খেয়ে গিয়ে ছেলে আমার এখন-যায় তখন-যায় হয়েছিল ! পাড়ার শীতলাঠাকুরুণের বামুন উদয় ভটচার্যি সেবার ছেলেকে আমার ভাল করে দেয়। মা শীতলা যেন উদয়ের কথায় উঠতেন বসতেন ! আহা, বেচারা গেলোও তাই মায়ের অনুগ্রহ হয়ে ! সেই যে গো—যেবার ফাগুন-চোতে রাক্ষুসে মারিগুটির মহামারিতে দেশ উজোড় হয়ে গেল—

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুধু বললেন—'হুম !' বেশ বোঝা গেল তাঁর রাগ তখনও যায় নি।

বিশুর মা বলে চললো—বাছা আমার যেই একটু সেরে উঠলো—নিয়ে পালিয়ে গেলুম একবারে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে ! ওর কি আর এই বাংলা দেশের ভেতো শরীর দিদি ? পশ্চিমে ডাল-রুটি খেয়ে ছেলে

আমার বলতে নেই একটু যেন ছিরি (শ্রী?) ফিরিয়ে এসেছিল। কিন্তু এলে কি হবে—?

পাশের বাড়ীর গিন্নী অসাবধানতা বশতঃ আবার বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন—এখানে ফিরেই বুঝি ম্যালেরিয়া ধরেছিল ?···কিন্তু, অতি কষ্টে তিনি জিহ্বা সংযত করে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে রইলেন।

বিশুর মা উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলো—কিন্তু এলে কী হবে? নিয়তি ফিরছিল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝেচ কি না! আসছিলুম গেঁয়োর খাল দিয়ে শালতি চড়ে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী। বিশু তখন সবে দু'বছরের। বড় দামাল দুষ্ট ছেলে। তাকে কোনও মতে কোলের মধ্যে সামলে নিয়ে বসেছিলুল। হঠাৎ একটা পেটো-বোটের ঢেউয়ের ঘা লেগে শালতিখানা দুলে উঠে কাত হয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না-পেরে আমি পিছুবাগে উল্‌টে পড়লুম। কোল থেকে ছেলে আমার ছিটকে একেবারে খালের জলে ঝপাৎ করে পড়ে গেল!

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে শিউরে উঠলেন—উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে বললেন—কী সর্বনাশ! তারপর?

বিশুরমা একেবারে দপ্‌ করে জ্বলে উঠে বললে—সর্বনাশ? আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে আমার সর্বনাশ হবে?

পাশের বাড়ীর গিন্নী ভাবলেন—'কী বিপদ! এর সঙ্গে কথা বলাও তো মুস্কিল? তিনি উঠে পড়লেন। বললেন আজ উঠি দিদি, বেলা গেল। হাঁড়ি হেঁসেল সব পড়ে আছে—'

বিশুর মা গালে হাত দিয়ে বললে—তুই কি পাষাণ রে! জলজ্যান্ত ছেলেটা ধড়ফড়িয়ে খালের জলে পড়ে গেল—আর তুই দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁড়ি হেঁসেল করতে চললি—তোদের কি কঠিন প্রাণ!

বিশুরমা অপ্রতিভ হয়ে আবার বসলেন ও কুণ্ঠিতভাবে বললেন—হ্যাঁ দিদি, বলো তো চট্‌ করে, বিশুর কথাটা শুনেই যাই। তারপর

কী হল? তুমি বুঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ছেলেকে ডাঙায় তুললে—!

—'নাও কথা! বলে—সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার ভার্যা? আমি কি তখন খাড়া ছিলুম যে জলে ঝাঁপ খাব? আমি ত তখন শালতির ওপর চিৎপাত! কানে শুধু একটা হট্টগোল এসে পৌছল—'গেল! গেল!' ব্যাপারটা এক মুহূর্তেই বুঝতে পেরে আমি আর উঠলুম না। শালতির পাটার উপরই গড়াগড়ি খেয়ে—বুকফাটা কান্না শুরু করে দিলুম—বিশুরে! বাপরে! ধন আমার!—

বিশুরমা রীতিমতো মড়া কান্না শুরু ক'রলে দেখে ভীত হয়ে পাশের বাড়ীর গিন্নী তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন—চুপ চুপ! দিদি—করছো কি? পাড়ার লোক শুনতে পেয়ে যে এখুনি ছুটে আসবে। ভাববে সত্যিই বুঝি বিশুর কিছু—

বিশুরমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠে' —সত্যি না ত কি মিথ্যে বলছি? —বিশু আমার গেঁয়োর খালে তলিয়ে গেলে কী হ'ত বলতো—দু'-বছরের কচি শিশু—ছেলে ত নয়—যেন ননীর পুতুল—

পাশের বাড়ীর গিন্নী অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'ছেলেকে বাঁচালে কে দিদি?—'

—'কে আবার? যিনি সব্বার মরণ-বাঁচনের মালিক! বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং! নইলে ওরকম অবস্থায় জলে পড়লে দু'বছরের বাচ্ছা কি বাঁচে?' কথাটা বিশুরমা বেশ গর্বের সঙ্গেই বললে!

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার যথার্থই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বিহ্বল ভাবে বললেন—দিদি, তোমার কী ভাগ্য! স্বয়ং ভগবান বিশ্বনাথকে তুমি সশরীরে দর্শন করেছ'। তোমাকে দেখলেও পুণ্যি! সার্থক ছেলে গর্ভে ধরেছিলে। বিশুর জন্যেই ত বিশ্বনাথকে দেখতে পেলে?'

বিশুরমা এবার বিরক্ত হয়ে বললে—'তুইত ভারি ন্যাকা মেয়েমানুষ

দেখ্‌ছি! বলি, ঠাকুর দেবতা কি সশরীরে দেখা দেন না কি? তবে, হ্যাঁ, মনে হ'ল বটে তিনিই আমার বিশুকে কোলে করে এনে আমার কোলে ফিরিয়ে দিলেন!

পাশের বাড়ীর গিন্নী ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন—সে কী রকম?

বিশুরমা ধমক দিয়ে বললে—তোর যে আর সবুর সইছে না লো! বলতেইত বসেছি তোকে সব। মন দিয়ে শোননা—বিপদভঞ্জন নারায়ণ মধুসূদনের কৃপায়—

পাশের বাড়ীর গিন্নী যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন—এই বললে তুমি বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং—

বিশুরমা আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন! বললেন—তোর মত নাস্তিক মেয়েত' আমি কখনো দেখিনি? হ্যাঁরে! তোরা কি হিঁদুর ঘরে জন্মাসনি? একথা কি কখনও শুনিসনি যে হরিহর একাত্মা! যিনিই নারায়ণ তিনিই শিব—

পাশের বাড়ীর গিন্নী শেষটা শোনবার জন্য অধীর হয়ে উঠছিলেন, আর কথা না বাড়িয়ে বললেন—অপরাধ হয়েছে দিদি, মাপ করো। আমি বুঝতে পারিনে। তারপর কি হ'ল?

—'হবে আর কি? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ওতো আমার যেমন তেমন ছেলে নয় যে জলে পড়লেই ঘটি বাটির মতো ডুবে যাবে?' ব'লে বিশুর মা বেশ গর্বের সঙ্গেই চারিদিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিল।

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার অতি সাবধানে বললেন—তা' ত বটেই?

বিশুরমা বলে চললো—মা কালী রক্ষে করলেন! দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী আমার নাড়ী-ছেঁড়াধন ফিরিয়ে দিলেন। সেখানে তখন জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছিল। খোকন গিয়ে পড়লো সেই জালে—

পাশের বাড়ীর গিন্নী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—তাই

বল্লো দিদি! ধড়ে আমার প্রাণ এল এতক্ষণে! খোকোন তাহলে জলে পড়েনি—জালে পড়েছিল?

—'আ মর্ মাগী! তুই কি রকম ন্যাকা বলতো? বলি, জল না হ'লে কি জেলেরা ডাঙায় জাল পেতে বসেছিল?' ব'লে রোষকষায়িত নেত্রে বিশুর মা পাশের বাড়ীর গিন্নীর মুখের দিকে চাইলেন।

পাশের বাড়ীর গিন্নী ভীত হয়ে উঠে বললেন—ওমা! তাও তো বটে! জল না হলে জাল ফেলবে কোথা? জালত আর তারা রোদে শুকোতে দেয়নি যে ডাঙায় বিছিয়ে ছিল?—তারপর দিদি?

বিশুর মা ক্রোধ সম্বরণ করে নিয়ে একটা ঢোক গিলে মুখে আর একটা পান ও খানিকটা দোক্তাপুরে বললেন—তারপর কি হ'ল—না, খোকা যেই জালে গিয়ে পড়ল জেলেরা অমনি—নিশ্চয় বড় গোছের রুই কাত্‌লা পড়েছে মনে করে তাড়াতাড়ি সড় সড় করে টেনে জাল গুটিয়ে ফেললে। খোকা তখন জালে জড়িয়ে পরিত্রাহী কাঁদছে!—

পাশের বাড়ীর গিন্নী পরম আগ্রহে বললেন—'তারপর?'

'তারপর আর কি? আমার কোলের ছেলে কোলে ফিরে এল! বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং যেন ধীবর-মূর্তি ধ'রে আমার বিশুকে আমার কাছে দিয়ে গেলেন।'

পাশের বাড়ীর গিন্নী বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—বাবার দয়ায় কি না হয়?

বিশুর মা বললেন—যা বলিছিস বোন—নইলে সেবার যখন বিশু ছাদ থেকে পড়ে—

পাশের বাড়ীর গিন্নী উঠে পড়ে বললেন—ওটা কাল শুনব দিদি!

দ্বিতীয় দিন

পরের দিন দুপুরে পাশের বাড়ীর গিন্নী কিন্তু আর বিশুর মা'র কাছে এলেন না। বিশুর মা কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষায় থেকে পান দোক্তার

কৌটা হাতে নিয়ে নিজেই পাশের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। পাশের বাড়ীর গিন্নী তখন ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন। বিশুর মাকে সশরীরে উপস্থিত হতে দেখে ভয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বিশুর মা কোনোদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে মাদুরের একপাশে জাঁকিয়ে বসে পড়ে বললেন,—'কই গো! কাল যে তুমি আসবে বলে এলে, কিন্তু আজ গেলে না কেন?'

পাশের বাড়ীর গিন্নী আমতা আমতা করে বললেন—ভাত খেয়ে উঠে আজ শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো দিদি, তাই ভাবলুম একটুখানি গড়িয়ে নিই, তারপরে তোমার ওখানে যাব। তা ভাই, তুমি এসে ভালই করেছ।

বিশুর মা বললেন—'আসব না? তুমি বলো কি ভাই? শেষে কি আধকপালে ধরে মরবো? কাল যে তোমাকে বাবা বিশ্বনাথের দয়ার কথা বলছিলুম, সে তো শেষ হয়নি বলা।'

পাশের বাড়ীর গিন্নী মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। বিশুর মা একবার বকতে শুরু করলে সহজে থামবে না। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঘরসংসারের কাজের ক্ষতি হবে। কিন্তু উপায়ই বা কি? বাড়ী বয়ে গল্প করতে এসেছেন ভদ্রমহিলা!

বিশুর মা ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন—কী ভাবছো দিদি? কাল কোন অবধি শুনেছো, এই তো? কাল বিশুর ছাদ থেকে সেই পড়ে যাওয়ার কথা শুরু করেছিলুম, সেই মুখে তুমি উঠে পড়লে।

পাশের বাড়ীর গিন্নী নিরুপায় হয়ে করুণ ভাবে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার কথা বলেছিলে বটে। বিশু বুঝি একতলার ছাদ থেকে—

বিশুর মা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কি? একতলার ছাদ?—তুমি যে

দেখি যা' মুখে আসে তাই বলে যাও !! আমার বাপের বাড়ী একতলা ? ঘাটালের ঘনশ্যাম বাঁড়ুয়্যের নাম তিনটে জেলার লোক জানে। চকমেলানো দোতলা বাড়ী—ঠাকুরদালান—চণ্ডীমণ্ডপ—রাসমঞ্চ—

বিশুর মা হয়তো আরও ফর্দ দিতেন, কিন্তু পাশের বাড়ীর গিন্নী চট্ করে বললেন—ও মা ! তা আর জানিনি ? তোমার বাপের বাড়ী—সে তো শুনেছি ঠিক রাজবাড়ীরই মতো ! তা' বিশু কি—

খুশী হয়ে বিশুর মা হেসে বললেন—তবে আর বলছি কি বোন ? মামার বাড়ীর ছাদ থেকেই ত পড়েছিল সেবার। তখন ওর বয়েস বছর আষ্টেক হবে। ডাগর হয়েছে। মামাতো ভাইয়েদের সঙ্গে ছাদে গেল ঘুড়ি ওড়াতে। সেকেলে বাড়ীর ন্যাড়া ছাদ জানইত ? ছেলে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখতে দেখতে কখন যে পিছু হেঁটে কার্ণিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল নিজেই টের পায়নি। তারপর যেই তার মামাতো ভাইয়েরা প্যাঁচের টানে ঘুড়ি কেটে দিয়েছে, অমনি 'ভো-কাটা—' বলে আহ্লাদে লাফ্ দিতে গিয়ে একবারে দোতলার ছাদ থেকে উল্টে পড়ে গেল নীচেয়—

পাশের বাড়ীর গিন্নীর দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—ওমা ! কী হবে ? ছেলে যে গুঁড়ো হয়ে যাবারকথা !

বিশুর মা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন—'সে তো বটেই বোন্! ছেলেকে কি আর জ্যান্ত ফিরে পেতুম ?'

পাশের বাড়ীর গিন্নী বললেন—'এবারও নিশ্চয়ই ওকে বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেছিলেন ?'

'—সে আর বলতে ! বাবা বিশ্বনাথের দয়া না থাকলে আমার বিশুকে আজ তোমরা কি কেউ চখে দেখতে পেতে ?'

জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন বিশুর মা। .

পাশের বাড়ীর গিন্নী একেবারে কৌতূহলে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন'—কেমন করে বাবা সেদিন বিশুকে রক্ষা করলেন দিদি ?'

ধীরে সুস্থে হাতের কৌটা খুলে বিশুর মা একটা পান আর খানিকটা দোক্তা মুখে পুরে ঠোঁট চেপে বললেন—বাবার দয়ার কি সীমে আছে ? রাজু ধোবা আমার বাপের বাড়ীর রজক। ভাগ্যে সেদিন রাজু খিড়কীর পুকুরে আমাদের বড়ো মশারীটা কেচে বাগানের গাছে গাছে বেঁধে টাঙিয়ে শুখুতে দিয়েছিল ! পড়বি তো পড় ছেলে আমার গিয়ে পড়লো ঠিক সেই মশারীর চালের উপরে। বাবা বিশ্বনাথ যেন কোল পেতে দাঁড়িয়েছিলেন ওকে ধরবার জন্যেই।

—'উঃ, বড্ড বেঁচে গেছে তো দিদি ! পাশের বাড়ীব গিন্নী বললেন, —শুনেত ভাই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে !

—'উঠবে না ? বলে গাঁ'শুদ্ধ লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল—তুমি তো ছেলেমানুষ ! শমনের মুখ থেকে ছেলেকে ফিরে পেয়েছি দিদি। বিশু আমার যমের হাত থেকে ফিরে পাওয়া ছেলে।' ব'লে বিশুর মা আর একবার অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করলেন।

পাশের বাড়ীর গিন্নী ভক্তিভরে বললেন,—বাবা বিশ্বনাথ দেখছি এবার রজকরূপে এসে তোমার বাছাকে বাঁচিয়েছেন। সেবার ধীবর-রূপে—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে বিশুর মা বলে উঠলো—তাই কি এক আধবার ? এমন কতোবার যে হয়েছে শুনলে তোমার চক্ষু স্থির হয়ে যাবে ! তবে বলি শোনো—সে একবার কালীপূজার সময় বাজী তৈরী করবে বলে বায়না ধরে আমার কাছে দু'টো টাকা চেয়ে নিলে। তখন ওর বয়েস বছর বারো হবে। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে জুটে বাজী তৈরী করতে গেছল। আমি মনে করেছিলুম, তুবড়ী টুবড়ী এই রকম কিছু আতসবাজী বানাবে বোধহয়। হতভাগা ছোঁড়াগুলো

যে ওকে কুবুদ্ধি দিয়ে ভুঁই পটকা, বোমা এই সব সর্বনেশে-বাজী তৈরী করতে পরামর্শ দিয়েছে কে জানে ? একরাশ কলেরাপটাশ মোমছাল গান পাউডার এনে হতচ্ছাড়া ছেলেগুলো বোমা বানাতে বসেছিল। নারকেলের মালায় ভরে যখন পাট জড়িয়ে বাঁধছে—বিশুর তখন খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। সে উঠে এসেছিল বাড়ীর ভিতরে জল খেতে। এমন সময়ে বলবো কি বোন! বাইরের ঘর থেকে এমন একটা বিকট আওয়াজ এল যেন একশোটা বজ্রাঘাতের আওয়াজের চেয়েও বেশি তার শব্দ! ঘরবাড়ী সমস্ত থর থর করে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই কাণে এলো ছেলেগুলোর 'বাপরে! মারে! হাঁউ মাউ' ভীষণ চীৎকার। 'দেখ্-দেখ্ কী হোলো ?' সবাই ছুটলুম বাইরের ঘরে। গিয়ে দেখি চারিদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। বিচ্ছিরী বিদ্‌ঘুটে বারুদের দুর্গন্ধে নাকে কাপড় চাপতে হোলো। বোমা ফেটে চোট খেয়েছে ছেলেগুলো সব কটাই! রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। কারুর হাতের সব কটা আঙুল উড়ে গেছে। কারুর পা এফোঁড় ওফোঁড়! একজনের মাথার খুলি ফেটে চৌচির!! কামারদের সেই ছেলেটা তো তখুনিই মারা গেল। অন্যগুলো ছ'মাস হাসপাতালে পড়ে থেকে—কাণা, খোঁড়া, মুলো, হাবা—এক একটা এক একরকম হয়ে বাড়ী ফিরলো।

পাশের বাড়ীর গিন্নী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ভাগ্যে বিশুর তেষ্টা পেয়েছিল দিদি! তুমি ঠিকই বলো, মারে কৃষ্ণ রাখে কে— ?

বিশুর মা খুব জোরে হেসে উঠে বললেন—আ মর্! "মারে কৃষ্ণ" কী রে! বল্ "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" ?

পাশের বাড়ীর গিন্নী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—ওই—ওই হোলো গো। তাই বলতেই চেয়েছিলুম। মুখ্যু মানুষ, উল্টো করে বলে ফেলেছি। তা' বাবা বিশ্বনাথ এবার পিপাসা রূপে এসে তোমার ছেলেকে রক্ষে করেছেন, কি বলো ভাই।

বিশুর মা বললেন,—ও কথা কি বলছো দিদি! "এই তো মাত্র হপ্তা দুয়েক আগের কথা। বিশু আমার ইস্কুল থেকে ফিরছে, হঠাৎ একটা ষাঁড় ক্ষেপে তেড়ে আসছে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে রাস্তা পার হয়ে এধারের ফুটপাথ থেকে ওধারের ফুটপাথে উঠতে যাবে—ঠিক সেই মুখে একটা মস্ত হাতীর মতো মিলিটারি ল্যরি আসছিল গোঁ গোঁ শব্দে ওদিক থেকে। ছেলে পড়লো ধাক্কা খেয়ে একেবারে সেই মিলিটারি গাড়ীর তলায়।

পাশের বাড়ীর গিন্নী শিউরে উঠে বললেন,—ওমা! কী হবে! তারপর? ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো তো?

বিশুর মা দপ্ জ্বলে উঠে বললেন,—শত্রুর ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাক। আমার বিশু বাবা বিশ্বনাথের দোর-ধরা। বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং ওকে বাঁচিয়ে দিলেন। ও পড়েছিল লম্বালম্বিভাবে উপুড় হয়ে সোজা সেই মিলিটারি ল্যরির তলায়। গাড়ী চলে গেল ওর উপর দিয়েই। রাস্তায় ভীড় জমে গেল। সকলেই হায় হায় করছে। এমন সময়ে দেখা গেল বিশু গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বাছার গায়ে আমার আঁচটুকু পর্য্যন্ত লাগেনি!

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে গম্ভীরভাবে বললেন,—একেই বলে দিদি—যথার্থ—বাবা বিশ্বনাথের দয়া! তোমার উপর ভগবান প্রসন্ন, নইলে এমন আশ্চর্য কাণ্ড কখনও কোথাও ঘটতে শুনিনি। তবে হ্যাঁ, চোখে দেখে এসেছি বটে একবার।

বিশুর মা একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—সে আবার কেমন কথা লো? যা' কখনো কাণে শোনোনি বলছো, তা' বাছা, চোখে দেখলে কী রকম?

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার একগাল হেসে বললেন,—ওমা! তা' জানোনা বুঝি দিদি? একবার আমার বড় মেয়ে আমাকে কোথায় যেন

কোন হাউসে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেছলো। সেখানে সব জ্যান্ত ছবি দিদি! কথা বলে, গান গায়! সেই বায়োস্কোপের ছবিতে দেখে-ছিলুম, রেলে ইঞ্জিনে কাটা পড়েও বেঁচে উঠলো, বন্দুকের গুলি খেয়েও মরলো না, জাহাজ থেকে অগাধ সমুদ্রের মাঝ মধ্যিখানে ফেলে দিলেও সাঁতার কেটে ডাঙায় এসে উঠলো, প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল বটে, কিন্তু, উঠে দাঁড়ালো। তুমি বাপু বিশুকে একটু সাবধানে রেখো। বায়স্কোপের লোকেরা যদি ওর সন্ধান পায় নিশ্চয় ওকে ধরে নিয়ে যাবে!”

কথাটা শুনে বিশুর মায়ের মনটা সত্যিই এত খারাপ হয়ে গেল যে জবাব দেওয়ার কথা আর মনে এলনা। আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী চলে গেল।

মাধ্যমিক শিক্ষা

দিল্লীর মীনাবাজারে চাঁদনি চকের ভিতর বকরিদের দিন বেজায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। খবর পেয়ে সেই মহলের থানার দারোগা সাহেব জনকতক চৌকিদার নিয়ে সরজমিনে তদারক করতে এলেন।

ঘটনাস্থলে এসে দেখেন দশ বারো জন হিন্দু-মুসলমান খুন জখম হয়েছে, মেলাই আড়ৎদারের গদি আর দোকান-পাট লুট হয়ে গেছে। ব্যাপারীরাও জন-পঁচিশেক রীতিমত ঘায়েল।

ব্যাপার দেখে দারোগা সাহেব ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। হিন্দু-মুসলমানের পরবে মিছিল বার করা নিয়ে দু’দলে দাঙ্গা ত’ আজকাল লেগেই আছে, কিন্তু, সে সব একটু আধটু ঠোকা-ঠুকির ওপর দিয়েই

যায়। এ যে একেবারে খুন জখম এবং লুঠ তরাজের ব্যাপার। স্থানে স্থানে অগ্নিকাণ্ডও ঘটেছে।

দারোগা সাহেব সাক্ষী সাবুদের এজেহার নিয়ে আশেপাশের মহল্লায় খানাতল্লাসি করে, বাজারের সবাইকে বারবার জেরা করেও আসামীদের কোনো কিনারা করতে পারলেন না। পুলিশের বড় কর্তারা এসেও ব্যর্থ হলেন।

ইতিমধ্যে ব্যাপারটা উঠে পড়ল একেবারে আইন সভার বড় মজলিশে। এল সেখান থেকে পুলিশের ওপর উপরওয়ালাদের কড়া চাপ। এ হাঙ্গামার মূলে কারা খোঁজ করে বার করতেই হবে। আসামীদের চট্‌পট্ গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া চাই।

দিল্লীর পুলিশের টনক নড়ল। দারোগা সাহেবের থরহরি কম্প। উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করতে না পারলে চাকরি রাখা দায়। হয় ট্র্যান্সফার, নয় ডিগ্রেড্ নয়ত একেবারে খতম!

সবচেয়ে মুস্কিল হল দারোগা সাহেবেরই! পুলিশের বড কর্তারা তাগাদা দিলেন তাঁকেই। তিন-চার-দিন ধরে উঠেপড়ে জোর তদ্বির করে, পীর, গোরাচাঁদ, মুস্কিল আশানের শিবৃনি মেনেও তিনি ত' হালে পানি পেলেন না। আসামীদের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না, চোরাই মালেরও কোনো সন্ধান মিললনা। দারোগা সাহেবের আর বুঝতে বাকি রইল না যে সত্য ঘটনা কেউ কবুল করছে না। দাঙ্গা-বাজেরা সব এক-কাঠ্ঠা হয়েছে। আসল লোকগুলোকে আগেই সরিয়ে ফেলেছে। লুটের মালও সব বেমালুম গায়েব।

দারোগা সাহেবের সবচেয়ে বিপদ হল এই জন্য যে, যারা মার খেয়েছে তারা কেউ কাউকে সনাক্ত করতে পারছে না। যাদের গদি আর দোকান-পাট লুট হয়েছে তারাও কেউ চিনতে পারছে না কাউকে। বলতে পারছে না তারা মানুষটাকে দেখে যে, এই লোকটাই তাদের

গদিতে বা দোকানে চড়াও হয়ে লুঠতরাজ করেছে। তারা বলে, হুজুর একদল লোক রে-রে শব্দে এসে ঢুকে পড়ল দোকানে। ঘন ঘন 'আল্লা হো আকবর' আওয়াজ করতে করতে তারা বে-পরওয়া লাঠি চালাতে শুরু করলে ডাইনে বাঁয়ে। সবাই তখন প্রাণ ভয়ে জান বাঁচাবার জন্য যে যেদিকে পেরেছি ছুটে পালিয়েছি। লোক দেখে মুখ চিনে রাখবার ফুরসুৎ পেলুম কখন? কেবল ছোট-বড় কাঁচা-পাকা দেদার চুল-দাড়ি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। অগত্যা দারোগা সাহেব নিরুপায় হয়ে গোয়েন্দা পুলিশের উপর ছেড়ে দিলেন এর যা-কিছু তদন্তের ভার।

দিল্লীর বাঙালীটোলার সবজান্তা ল্যরেন্স হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমগঞ্জের কুঞ্জ বিশ্বাসের ভাগিনেয় শ্রীমান চন্দ্র চৌধুরী। আধা-বয়সী বুড়োর দল তাকে ডাকত 'চৌধুরী চাঁদ' বলে, আর ছেলে ছোকরাদের আসরে সে ছিল 'চন্দর চাচা'। শহরে একটা কিছু লাগলে হয়, চন্দ্র চৌধুরীর অমনি যেন মরশুম পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলে বুড়োর বৈঠকে তার খাতির তখন দেখে কে? যে খবর পুলিশ কমিশনার জানেন না, যে খবর লাট সাহেবও জানে না, চন্দর চৌধুরীর কাছে কিন্তু আগেই তা এসে যায়।

আজগুবি গল্প বানিয়ে বলে আসর সরগরম রাখতে চন্দর চৌধুরীর জুড়ি ছিল না। আবগারি মহলে ছিল তার নির্বিচার অধিকার ও নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। যেদিন যখন যে আড্ডায় যা জুটত চন্দর চাচা খোশ মেজাজে তাই সেবা করতেন। স্থান কাল পাত্রের কোনো বালাই ছিল না চাচার। তবে নেকনজরটা ছিল তাঁর 'জল পথের' চেয়ে 'স্থল পথের' দিকেই বেশী। সুতরাং অহিফেন ও গঞ্জিকার মিশ্রিত মৌতাতে চাচার মগজে বিশেষ করে যে সব খান্দানি খবর গজিয়ে উঠত বিশ্বব্যাপী 'রয়টর' বা 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' সাধ্য ছিল না যে তার হদিস পায়!

কাজেই এমন একটা দাঙ্গার মরশুমে চন্দর চাচা চুপ করে থাকবার পাত্র নন। আঁড্ডায় আড্ডায় ঘুরে তিনি এমন সব আচাভোয়া বোম্বাচা গুজব আমদানী করতে শুরু করে দিলেন যে শ্রোতার দল একেবারে তাজ্জব বনে যেতে লাগল। চৌধুরী যা বলছে সেটা যে সম্ভব হতে পারে না এরকম একটা সংশয় ও সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি মারলেও এবং কথাটার সবটা সঠিক বিশ্বাস করতে না পারলেও চন্দরের বোল-চালের কায়দায় ঘাবড়ে গিয়ে সেটা কবুল করতে কেউ সাহস পেত না। তাদের এই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে চৌধুরীর উদ্দাম কল্পনা মরিয়ার মতো উধাও হয়ে ছুটত সব রকম সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পার হয়ে। যারা শুনত তারা ভাবত এ আজব দুনিয়ায় কিছুই বিচিত্র নয়!

সেদিন সন্ধ্যার পর চন্দর চাচা ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ানজীদের দেউড়িতে এসে হাজির হলেন। রায়সাহেব সারদা মল্লিক ছিলেন নিমকির দেওয়ান। মজলিশি লোক। দিলদরিয়া মেজাজ। সন্ধ্যার পর তাঁর বৈঠকে দিল্লীর হোমরা চোমরা বাঙালী বাবুরা সবাই প্রায় জমায়েৎ হতেন। আজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন 'আর্য-বঙ্গ-মিডল ইংলিশ স্কুলের' হেড মাস্টার অক্ষয় মজুমদার, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটেরিয়েটের হেড ক্লার্ক নন্দ তরফদার, রয়েল হিন্দু বোর্ডিংয়ের প্রোপ্রাইটর মুকুন্দ মহলানবীশ, দি নিউ নূরজাহান ফার্ম্মাসির ডাক্তার অতুল সরকার, মিলিটারী এ্যাকাউণ্টসের বড়বাবু কেদার কোলে আর কমিশেরিয়েটের কণ্ট্র্যাক্টর হৃষি দালাল।

চন্দর চৌধুরীর এখানে ছিল অবাধ গতিবিধি। কিন্তু অনেক আড্ডায় তাকে হাজিরা দিতে হত বলে এখানে ঠিক নিয়মিত আসতে পারত না। আর সবাই যেমন ছিলেন এ আড্ডার ডেলি প্যাসেঞ্জার, চৌধুরী তা ছিল না। চৌধুরী চাঁদের উদয় হত এখানে মাঝে মাঝে—অকস্মাৎ; কারণ

এখানে চা আর পান তামাক ছাড়া আর কোনো কড়া নেশার ব্যবস্থা ছিল না! চৌধুরীকে সেদিন হঠাৎ হাজির হতে দেখে প্রায় সকলেই সাদর অভিবাদন জানিয়ে বলে উঠলেন 'আরে কেও! চৌধুরী চাঁদ যে! এস এস, বস। এবার অনেক কাল পরে তোমার টিকি দেখতে পাওয়া গেল—'

চৌধুরী বসতে বসতে বললে 'এখনও ত তবু টিকি দেখতে পাচ্ছ এর পর দেখবে শুধু দাড়ি! দিল্লী শহর ত পড়ে গেছে জিন্না সাহেবের পাকিস্তানের চৌহদ্দির মধ্যে।

'সে আবার কি?' বলে কেউ চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। কেউ হেঁকে উঠল—'ওরে চৌধুরী চাঁদকে তামাক দে'! কেউ বললে—'চা নিয়ে আয়—পান নিয়ে আয়।'

দেওয়ানজীর বৈঠকে আজ রীতিমত একটা সোরগোল পড়ে গেল।

কাশ্মীরী চেনার চায়ের ট্রেতে রঙীন ফুলকাটা পোর্সিলেনের পেয়ালা পিরিচ তরল চায়ে ভরে উঠে টল ঃ করতে করতে চন্দরের সামনে এসে হাজির হল। পেয়ালা থেকে গরম চায়ের ধোঁয়া উড়ছে। দামী দার্জিলিং চায়ের লোভনীয় খোশবায়ে রসনা তৃষিত হয়ে উঠল। দেওয়ান সারদা মল্লিক ঠেলে দিলেন চৌধুরী চাঁদের দিকে চাঁদির তেঘরা পান-দানীটা। একধারে তার সাজানো রয়েছে তৈরি মিঠে খিলি আর মগাই দোনা, একধারে এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি প্রভৃতি পানের মশলা আর একধারে সুর্তি, জর্দা, কিমাম্, সেন্‌সেন্, তাম্বুলবিহার ইত্যাদি। গড়গড়ায় তাওয়া দেওয়া অম্বুরী তামাকের ভুর ভুরে গন্ধে গোটা কামরাটা যেন মশগুল হয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই ফ্যাশানেবল্ প্রগতির যুগে যখন সবার বাড়ী ড্রয়িংরুমের আওতায় সোফা কৌচের সরঞ্জামের মধ্যে চা চুরুট সিগারেট্ এবং হুইস্কী, সোডা, আইস্-ক্রীম ছাড়া আর কিছু অচল, তখনও দেওয়ানজী কুঠির এই ফরাসপাতা

বৈঠকখানায় বনিয়াদী পুরানো চালই বজায় ছিল।

চন্দর চৌধুরীকে দুবার অনুরোধ করবার প্রয়োজন হলনা। চায়ের বাটী নিঃশেষে শেষ করে, পান আর জর্দা মুখে পুরে গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে ভর ভর করে দু'চার টান মেরে ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চৌধুরী চাঁদ বলতে সুরু করলে—'আর কেন দাদা! জাল সব গুটিয়ে ফেল। দিল্লী এইবার আমাদের ছাড়তে হবে।'

দেওয়ানজী হাসতে হাসতে বললেন—'চৌধুরী চাঁদ দেখছি সেদিনের দাঙ্গাহাঙ্গামায় বড্ড বেশী ভয় পেয়েছে?'

মিলিটারী রসদের ঠিকাদার সূর্য দালাল বললেন—'এতেই এত ভয়? বোমা পড়তে সুরু হলে না জানি চৌধুরী চাঁদের কি হাল হবে!'

জঙ্গী সেরেস্তার বড়বাবু কেদার কোলে মন্তব্য করলেন—'ক্ষেপে যাবে বোধ হয়!'

হিন্দু সরাইখানার মালিক মুকুন্দ মহলানবীশ বললেন—আরে, এত সামান্য ব্যাপারে এত ভয় পেলে চলবে কেন? এরকম দাঙ্গা হাঙ্গামা ত আজকাল সর্বত্রই হচ্ছে! প্রোসেশান বার করেছ কি মাবামারি! তা সে ঠাকুর বিসর্জনেরই হোক, ববযাত্রীবই হোক, আর বথ্‌রিদেরই হোক—'

চন্দ্র চাচা গম্ভীর ভাবে বললে—'ভয় কাকে বলে চন্দব চৌধুরী তা জানে না। পিছন থেকে চোরের মত গিয়ে ছুরি মারতে পারিনি বটে, বা মেয়েছেলের গায়ে ফশ্‌ করে হাত দিতেও হাত ওঠে না আজও, একথা ঠিক, কিন্তু দাঙ্গাবাজ আমরাও বড কম নই! বখরিদ নিয়ে বখেড়া সুরু করিছিলুমত' আমরাই প্রথম। সে কি আজকের কথা? বছর পনেরো আগে সেই আলি মসজিদের বাইরে গরু জবাই করা নিয়ে—মনে আছে ত' দালাল? তুমিত ছিলে সেবার আমাদের পাণ্ডা। হঠাৎ মা ভগবতীর প্রতি তোমার ভক্তি একেবারে উথলে উঠেছিল!

গো-মাতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে বসেছিলে! অথচ, রসদের কণ্ট্রাক্টারি বজায় রাখতে উত্তর ভারতের মিলিটারী ছাউনি গুলোয় টাটকা গোমাংস সরবরাহ করে এসেছ' প্রতিদিন—মণ হিসেবে নয়, টন হিসেবে!'

সুর্যি দালালের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। আমতা আমতা করে বললে—'সে আমার ব্যবসা, সেত আর ধর্ম নয়—ধর্মে হাত দেওয়া আমরা সইব কেন? এর জন্য যদি দু'চারটে মাথা ফাটাতে হয় আমি তাতে ভয় পাইনি। দাঙ্গা করতে রাজি আছি।'

"—বলি, ওকথাটাত ঠিক অমনি করে ওরাও বলতে পারে হে? সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?" তারপর, অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানা চালে বললেন চন্দ্র চাচা—হ্যাঁঃ! তোমরা দাঙ্গা হতে দেখ' শুধু ওই বিসর্জন আর বিয়ের মিছিল নিয়েই! বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ধর্মের ছুতো ধরেই ঘটছে বটে, কিন্তু, আসলে এর মূলে যে কি ব্যাপার—শুনলে তোমাদের হাত [illegible]য়ে খিল ধরে যাবে। 'মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে যেতে দেবনা' ও একটা নেহাৎ ওজোর বইত নয়। তোমাদেরও—'গো-কোর্বানি করতে দেবনা'র মধ্যে ওই একই মনস্তত্ত্ব! কথামালায় পড়নি "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নেই।"

আর্য্যবঙ্গ-মিডল-ইংশিল ইস্কুলের হেডমাষ্টার অক্ষয় মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বললেন—এ আপনার অত্যন্ত অন্যায় মন্তব্য। অবশ্য, আপনি বলতে পারেন এটা উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মের গোঁড়ামী। কিন্তু, গোঁড়া হলেই যে তারা দুরাত্মা হবে এমন কোনো কথা নেই। ধরুন, চরকা খাদি ও অহিংসা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী অপেক্ষা গোঁড়া বোধকরি ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, কিন্তু লোকে তাঁকে 'মহাত্মাই' বলে; কই, দুরাত্মা তো বলেনা কেউ।

—"বল্‌বে বলবে। দু'দিন সবুর করো মাস্টার।"

সেক্রেটেরিয়েটের হেড কেরাণী নন্দ তরফদার একটু সন্দিগ্ধ ভাবে

প্রশ্ন করলেন—পাকিস্থান কি সত্যই হবে ?”

গড়গড়ার নল মুখ থেকে টেনে বার করে নিয়ে—সেই নলটাকেই বাঁহাতের তালুর উপর সজোরে চাবুকের মতো আছড়ে চন্দর চাচা বলে উঠল—আলবৎ ! হিজ হাইনেস দি আগাখাঁর গোপনে প্রস্তাবিত এবং লীগেশ্বর জনাব কায়দে আদম জিন্না সাহেবের ফরমাইজি পাকিস্থান আসছে ঐ আফগানিস্তান—বেলুচিস্থান—ওয়াজিরিস্তানেরই বংশধর হয়ে। হিন্দুস্থানের এ অঞ্চল থেকে কাফেরদের একদম খতম করতে না পারলে এখানে পাকিস্তানের আস্তানা গাড়া সহজ সাধ্য নয়। সেই মতলবেই খাক্‌সার সেপাই তৈরি হচ্ছে হাজারে হাজারে। ওদের কাঁধের বেল্‌চা গুলো যথাসময়ে হাতের হাতিয়ার হয়ে উঠবে জেনো !”

সূর্যি দালাল বললে—“তা বই কি ? ও বদ্‌লাতে আর কতক্ষণ ? খৃষ্টান মিশনারীদের একদা পবিত্র ‘ক্রশ’ যদি কালক্রমে ‘আয়ারণ ক্রস’ বা ‘ভিক্টোরিয়া ক্রস্’ হয়ে উঠতে পারে, তাহলে এ কয়লার চামচেই বা ‘সঙ্গীন’ হয়ে উঠবে না কেন ?

জঙ্গী দপ্তরের বড়বাবু কেদার কোলে ঘাড় নেড়ে বললেন—অত সোজা নয় হে দালাল। একি তোমার রসদের ঠিকাদারি ? ফাঁকি দিয়ে বিশ হাজার গ্যালভানাইজড্ বালতির বদলে দশ হাজার টিনের মগ চালিয়ে বিল পাশ করিয়ে নেবে ?

সকলে হো হো হো করে হেসে উঠলেন। চন্দর চৌধুরী আরও গোটাকতক পান আর একমুঠো জর্দা মুখে পুরে গড়গড়ার নলে টান মেরে বললে—আছো বাবা সব আরামে হস্তিনাপুর আর ইন্দ্রপ্রস্থে—আমিরী চালে—বহাল তবিয়তে ! দেশের খবর তো রাখনা কিছু ? তোমাদের সোনার বাংলা যে ‘হক্ মুল্লুক’ থেকে লীগের কৃপায় ‘খাজাবাদ’ হ’য়ে উঠেছে। তিন-হাজারী উজীর সাহেবরা যা-ইচ্ছে করছে সেখানে। বাংলা দেশের নাম বদলে ওরা ‘পূর্ব-পাকিস্থান’ রাখবে

বলে ভয় দেখিয়েছে।

দি নিউ নূরজাহান ফার্মাসির ডাক্তার অতুল সরকার গম্ভীর ভাবে বললেন—ওরা সেখানে সংখ্যায় বেশী, সুতরাং মেজরিটির মতে 'বাংলা দেশ' নামটা যদি ওরা বদলে রাখতেই চায় তাতে ক্ষতি কি? এমন ত কত দেশের নাম কতবার বদলেছে এই পৃথিবীতে। 'শ্যামদেশ' হয়ে গেছে থাইল্যাণ্ড, পারস্য হয়ে গেছে এখন 'ইরাণ', আরব হয়ে গেছে 'ইরাক'। বাংলা দেশকেও 'পাকিস্থান' করে নেবার ওদের সম্পূর্ণ 'রাইট' আছে—।"

চৌধুরী চিৎকার করে উঠল—কখনই না। তা হলে জিন্নার 'মাইনরিটি প্রোটেকশনের' আব্দারকে পার্লিয়ামেণ্টের কর্তারা মাথায় করে নিয়ে নাচতে পারত না। গোটা ভারতবর্ষের বেলা মাইনরিটির স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ সুবিধা দাবী করবো, মেজরিটির রাইট মানবনা, বলব সেটাকে মেজরটি সম্প্রদায়ের Tyranny! আর বাংলা দেশের বুকে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়ে বসে সেই Tyrannyই চালাবো—এ চলবে না! আর এটা যে আমাদের ঢাকা বরিশালের বড় মিঞারা জানেন না, তা ভেব না। খাজা সাহেবকে নেহাৎ 'খাজা' মনে করোনা। হক্ সাহেবও 'হক কথা' বোঝেন। তবে, মানা-না-মানা অবশ্য আলাদা কথা। বাংলা দেশকে ওঁরা পাকিস্থান করে তোলবার চেষ্টায় মন্ত্রিত্ব হাতে পেয়েই উঠে পড়ে লেগে গেছেন। ছেলে মেয়ে গুলোর মাথা খাবার ব্যবস্থা আগে না করতে পারলে সব চেষ্টাই বৃথা হবে বুঝে মক্তব মাদ্রাসা গুলোয় সে কাজ বহুদিন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রাইমারী শিক্ষা মুঠোর মধ্যে এনে এইবার ওঁরা 'সেকেণ্ডারী এডুকেশনে' হাত বাড়িয়েছেন। কারণ পাঠশালার আটচালা ভাঙলেইত আর কাজ হবে না, স্কুল কলেজগুলোও হাত করতে হবে, নইলে ছেলে মেয়েদের আখের উমের চট করে মাটি করা যবে না! ওদের বাংলা বুলি ভুলিয়ে উর্দু জবানে

রপ্ত করে তুলতে হলে শিক্ষার গোড়া থেকেই দীক্ষা দেওয়া দরকার। পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে খাস উর্দু! সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সবই বদলাতে হবে। এবং তা করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার বুকে না পারি পিঠে অন্ততঃ ছুরি মারতেই হবে! ইতিহাসের পাতাগুলো একে একে পালটে ফেলা সুরু হয়ে গেছে। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিটা হিঁদুরাই বেকুফের মত বেমালুম সাফ্ করে ফেলেছে। যত জেলে-যাওয়া, মার আর গুঁতো খাওয়ার কাজ—তা এ পর্য্যন্ত একটাও ওদের করতে হয়নি। ওরা দিব্যি তোফা আরামে বাড়াভাতে এসে বসে গেছে!

সেক্রেটেরীয়েটের হেড ক্লার্ক নন্দ তরফদার বলে উঠলেন—এ সমস্তই তোমার কাল্পনিক অভিযোগ চৌধুরী চাঁদ। মক্তব মাদ্রাসায় পড়লেই হিঁদুর ছেলেরা যদি বিগড়ে যায়, তা হলে, যারা আজ লীগের পাণ্ডা—তারা হিন্দু মহাসভার ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়াত। কারণ, তারা অধিকাংশই ছেলে বেলা থেকে লেখাপড়া শিখেছে হিঁদুর ইস্কুল পাঠশালাতেই। তোমাদের নিজেদের কোনো ক্ষমতা নেই, সাহস নেই, মুরদ নেই কিছু করবার, এখন তারা নিজেদের দেশের ও জাতের ভাল করছে দেখে তোমরা হিংসেয় জ্বলে উঠছ! তোমাদের হাতে ত' সরকারী ক্ষমতা অনেকদিন ছিল, কি করতে পেরেছিলে তোমারা হিঁদুদের জন্যে? ভয়েই মরেছ কেবল সাহেব কি ভাববে? লাট সাহেব কি মনে করবে! কিন্তু ওরা ওসবের কিছু পরোয়া করে না। কেমন তিন বছর যেতে না যেতে ওরা গভর্নমেণ্ট আর আধা গভর্নমেণ্ট সব অফিসের সব ডিপার্টমেণ্টের চুড়োয় চাচাদের এনে বসিয়ে দিয়েছে। সেক্রেটেরীয়েটের উঠনে মসজিদ গেঁথে ছেড়ে দিয়েছে! আর তোমরা এতকাল ধরে একটা মন্দির চুলোয় যাক্, একটা তুলসী তলাও গাঁথতে পারনি! মুখ নেড়ে আর কথা বলতে এস না। এক কথায় দশলক্ষ টাকা খরচ করে দিলে ওরা

'লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ ফর গার্লস' খুলে! আর তোমরা পড়ে আছ সেই টিম্‌টিমে 'বেথুন কলেজ' বুকে করে আজও। গ্রামে গ্রামে ওরা মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, লাইব্রেরী, টিউবওয়েল সব বসাচ্ছে। রাস্তা, ঘাট, সাঁকো, বাজার, বানাচ্ছে। ঋণ সালিশী বোর্ড, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী বিল প্রভৃতি পাশ করিয়ে গরীব দুঃখীর প্রাণ বাঁচাচ্ছে; দলের সংবাদপত্রখানিকে রক্ষা করতে অকুতোভয়ে ত্রিশহাজার টাকা বার করে দিয়েছে। তোমরা কখনও হাজার টাকা দিয়েও কোনো খবরের কাগজকে সাহায্য করতে পেরেছিলে? স্বয়ং স্যার সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'র মত কাগজ-খানাও আজ লোপ পেয়ে গেছে!

চন্দ্র চৌধুরী এবার আমতা আমতা করে বলতে লাগল—আমরা সব ভদ্রলোক, উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাদের একটা চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস আছে তো! যেখানে আমরা ছিলুম জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকীল, মোক্তার আর ওরা ছিল দপ্তরী, পেয়াদা, আরদালী, চাপরাশী, খিদমৎগার, সেখানে বুঝেই দেখনা কেন! ক্ষমতা হাতে পেলে ক্ষমতার অপব্যবহার তো হবেই।

মিলিটারী একাউণ্টসের বড়বাবু কেদার কোলে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—'মুখ সামলে কথা বলো চৌধুরী! একদিন এদেশের নবাব বাদশাহ আমীর ওমরাহ ছিল ত ওরাই! ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হবার আগে ওরাইত' ছিল এদেশের শাসক-সম্প্রদায়! আজ যদি ওরা তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে, তোমাদের তাতে গাত্রদাহ হলে চলবে কেন? তোমরাতো আজ আটশ' বছর ধরে গোলামীই করে আসছ, তোমাদের ভেতর কি আর কোনো পদার্থ আছে?'

চৌধুরী অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বললে—তুমি হচ্ছ সরকারী কেরাণী। তুমিত ওদের হ'য়ে বলবেই। তোমার 'স্লেভ্‌ মেণ্ট্যালিটি' যাবে কোথা? একবার তলিয়ে ভেবে দেখছ কি, যদি আর দশটা বছর ওরা

এই ভাবে উজিরী চালায় তাহলে হিন্দুর ছেলে মেয়েদের আর হিন্দু বলে চেনা যাবে না! তাদের হতে হবে ক্রমে বিড়িওয়ালা, বাবুর্চি, খানসামা, গাড়োয়ান! তাদের কথাবার্তা, হালচাল, ভাব-ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ সব বেমালুম বদলে যাবে! ইংরেজ আমলের হ্যাট কোট স্যুট সার্ট ছেড়ে আবার চোগা চাপকান আচকান জোব্বা লুঙ্গি পায়জামা পরতে হবে।'

ডাক্তার অতুল সরকার বললেন—'তাতে ক্ষতিটা কি? হ্যাট কোর্ট পরে ফিরিঙ্গী সেজে ইংরিজি বুলি আওড়াতে তোমাদের লজ্জা করে না, আর যত লজ্জা বুঝি চোগা-চাপকান পায়জামা আচকান পরতে? ওটা হ্যাট কোটের চেয়েও ঢের ভদ্র আর সভ্য!

চৌধুরী অধৈর্য হয়ে বলে উঠল—সভ্য অসভ্যর কথা হচ্ছেনা ডাক্তার। হিঁদুর ছেলেকে আর হিঁদু বলে চেনাই যাবে না। সেইটেই হচ্ছে এই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যা। হিঁদুব ছেলেকে এখন মক্তবে গিয়ে পডতে হবে—

অ-য়ে অজুর্দার আসছে তেড়ে।
আ-য়ে আণ্ডা খাব কেড়ে॥

কিম্বা

ক-য়ে কলমা পড়াও ধরে।
খ-য়ে খচ্চর হাঁকাও জোরে॥

শুন্‌ছি নাকি স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সেই প্রসিদ্ধ কবিতাটি—

'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল'—

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কবিতাটিকে তাঁর বর্ণ পরিচয় প্রথমভাগে স্থান দিয়ে অমরত্ব দান করেছেন—মক্তবের কল্যাণে তা এখন বদলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—

কুঁকুড়া হাঁকিল ওই ফজের হইল,
গুল্‌বাগে ফুল যত বিল্‌কুল ফুটিল।
উঠ বাচ্চু, কর ওজু, পর লুঙগি ফেজ,
খোদার নামাজে দিল করহ আমেজ।

'কর-খল' ভুলে তারা পড়ছে এখন—'কলিজা-খলিফা' 'অজ-আম'র বদলে 'অকুব-আখের' চলেছে; আর এই ভাবে প্রাথমিকের পর মাধ্যমিকও যদি চলে, তাহলে—ঐযে বললুম—দশ বছরের ভিতরেই হিন্দু শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের—ওর নাম কি—দফা গয়া!

আর্যবঙ্গ মিড্‌ল-ইংলিশ-ইস্কুলের হেড মাস্টার অক্ষয় খাশনবিশ মহাশয় চিন্তিতভাবে বললেন—'চৌধুরী মহাশয় যা বলেছেন সেটা ভাববার কথা বটে। মক্তবের পাঠ্য পুস্তক পড়ে যে সব ছেলে তৈরি হবে তারা এরপর বাপকে বলবে 'বাপজান' মাকে বলবে 'আম্মা'। হিঁদুর ঘরের শাশ্বত মাসি পিসি ঠাকুমা দিদিমার আর অস্তিত্ব থাকবে না, আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরে দেখা দেবে যত বোরখা খোলা 'ফুফু' 'নানী'র দল।

নিম্‌কির দেওয়ান রায় সাহেব সারদা মল্লিক বিরক্ত হয়ে বললেন—'এ তোমাদের মিথ্যে ভয়। ও বেচারারা সব তাসের গোলাম বইত নয়! ওদের সাধ্য কি যে হিঁদুয়ানী লোপ করে দেবে। বলে—বড় বড় হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল! আরে, তাবড় তাবড় সব চেঙ্গিস্‌ খাঁ, নাদীর শা, গজনীর মামুদ, কুতুবুদ্দীন, বক্তিয়ার খিলিজির মত কালা-পাহাড়ের দল, মায় শাহান্‌শা বাদ্‌শা ঔরংজেব পর্যন্ত চেষ্টা করে যাদের

টিকি পৈতে শালগ্রাম শিলা লোপাট করতে পারেনি, তাদের শিক্ষা ও সভ্যতা কি এতই ঠুনকো মনে করো, যে চুনোপুঁটি জনকতকের চেষ্টায় তা বাতিল হবে? হিঁদুয়ানীর জড় মাবা অত সোজা নয়। চেষ্টা করে ছিলেন একবার দু তিন হাজার বছর আগে কপিলাবস্তুর সেই বাস্তু ঘুঘু—তোমাদের সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধদেব হে! কিন্তু, শুদ্ধোধনের ব্যাটার পরিণামটা কি দাঁড়িয়েছে দেখছত! বাছাধনকে হিঁদুর দশ অবতারের খাতায় নাম লিখিয়ে ঠাণ্ডা হ'তে হয়েছে। এক সময় এদেশে আল্লা-পুরাণও রচিত হয়েছিল জান? হিঁদুয়ানীতে হাত দিতে যাওয়া মানে সাগরে ঝাঁপ খাওয়া।

রয়েল হিন্দু বোর্ডিংয়ের মালিক মুকুন্দ মহলানবিশ একেবারে গদ-গদ হয়ে উঠে বললে—যা বলেছেন রায় সাহেব। এইত আজ প্রায় দেড়শ বছরের ওপর হল সেই কেরী-মার্শম্যান-মেকলের আমল থেকে হিন্দুর ছেলেরা টোল পাঠশালা ছেড়ে ইংরিজী স্কুল কলেজে লেখা পড়া শিখে আসছে। B L.A. ব্লে, C.L.A. ক্লেতে তাদের হাতে খড়ি হচ্ছে। এ-ডবল-এস্ Ass—'এ্যাস্ মানে গাধা' বানান করে মুখস্ত করছে, কিন্তু কটা ছেলে আর সত্যিই গাধা বনে গেছে বলো? পাদরি বাবাবা কি কম চেষ্টা করেছেন, না এখনও করতে কিছু কসুর করছেন? কিন্তু, হলে কি হবে? হিঁদুয়ানী একেবারে পাথরের বিগ্রহ, বিশ্বম্ভর মূর্তি বাবা! নট-নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু। লাখে লাখে 'বাইবেল' বিলি করেছে তারা, মথি লিখিত সুসমাচার পড়িয়ে আমাদের ইস্তক নাগাদ শিখিয়েছে যে, ঈশ্বরের একজাত পুত্র সদাপ্রভু যীশু আমাদের একমাত্র ত্রাণ কর্তা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দেখা গেল না ঈশ্বরের সেই একজাত পুত্র যীশু বাংলাদেশের সংকীর্তনে মেতে গেছেন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীখৃষ্ট কীর্তনও চলেছে নগর পরিক্রমা করে! প্রভু যীশু এখানে মা শীতলা আর ওলা বিবির ঠ্যালায় একেবারে শিশুর মত অসহায়।

হিঁদুয়ানীর কুসংস্কার থেকে পাদরীরা আমাদের মুক্ত করতে পারলেনা, উল্টে ফিরিঙ্গী কালী বসে গেল বৌবাজারের চুনোগলিতে। আমাদের ছেলে মেয়েরা ছেলেবেলা থেকেই ইংরিজি পড়তে লিখতে শেখে, ইংরাজী খবরের কাগজ চালায়, তাবলে কি বাঙালী হিন্দুর বাংলা-সাহিত্য লোপ পেয়ে গেছে? সাত আটশ বছর ধরে মোগোল পাঠানের আমলে উর্দু ফার্সি পড়ে আমাদের জবান চোস্ত ও দুরস্ত হয়ে গেছল। তিন চারশ আর্বি ফার্সি শব্দ আমাদের ভাষায় বেমালুম আত্মসাৎ করে নিয়েছি কিন্তু তবু বাংলা ভাষা বাংলাই আছে, তুর্কী বনে যায় নি। সুতরাং ও যতই কুঁকড়ো ডাকিয়ে ফজের করুক না ফজলু চাচার দল, হিঁদুর ছেলেরা ভোরেই উঠবে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে। মক্তবে বসে তারা যতই আশমানে উড়ুক বা পানিতে ডুবুক, চাঁদ দেখবার জন্য তারা আকাশের দিকেই চাইবে আর তৃষ্ণা পেলে তারা পানির বদলে জলই খাবে। উর্দু ভাষা হ'ল কালকের চ্যাংড়া ভাষা। 'কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড' হবার অনেক আগেই ওর মধ্যে হিন্দি আর উর্দু ঢুকে পড়েছে 'Fifty-Fifty!' হিসেবে। ওর কর্ম কি এই বনেদী পালি-প্রাকৃত সংস্কৃতের বংশজাত প্রাচীন বাংলাকে মাধ্যমিকের মুগুর মেরে নস্যাৎ করা? বলি আমাদের গফুর মিঞা আর মনসুর আলিরা যে কে কত বাড়ীর ভিতর উর্দু বললেন সেত আমাদের জানা আছে!'

নিউ নূরজাহান ফার্মাসির ডাক্তার অতুল সরকার নিজেরই উরু দেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে বললেন—'আলবাৎ! মাকুন্দ ঠিকই বলেছে (মুকুন্দ বাবুকে আড্ডায় 'মাকুন্দ' বলে ডাকা হত।) ওরা আদম সুমারীর কারসাজিতে মাথা গুন্তিতে যতই বাড়ুক, মাথায় বাড়তে এখনও ঢের দেরী। ওরা যে আজও নেহাৎ নাবালক সেটা ওদের ঐ পাকিস্থানের আব্দারেই মালুম দিয়েছে। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে ওরা জলে বাস করতে চায়! চল্লিশ কোটী

ভারতবাসীর মধ্যে চাচারা তো মোটে দশ কোটী, তাদের আবার অত রস কেন? হিন্দুস্থানে জন্মে, হিন্দুস্থানে বাস করে, হিন্দুস্থানের নিমক্ খেয়ে, হিন্দুর সর্বনাশ করতে চায় যারা তাদের গোস্তাকী মাফ করা চলে না। বেকুফ্ কি আর গাছে ফলে? ওরা আয়ার্লাণ্ডের আল্স্টারের মত এখানে পাকিস্থান করতে চায়! এটা যে কতবড নিকমহারামী কাজ এ দুনিয়ায় যে শুনবে সেই বলবে।

রায়সাহেব সারদা মল্লিক বললেন—ওদের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া করে আপোষ মীমাংসায় ব্যাপারটা রফা করতেই হবে। গান্ধীজী সেই চেষ্টাই করছেন।

হেড মাস্টার অক্ষয় খাশনবিশ বললেন—বড কঠিন সমস্যা রায়সাহেব। ইংরেজ আমাদের ইংরিজী শিখিয়েছে বটে, কিন্তু, আমাদের ধর্মে সে যেমন কখন হাত দেয়নি, তেমনি আমাদের মাতৃভাষাকেও সে কখন স্পর্শ করেনি। কাজেই, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের পক্ষে এ ভাষাকে গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। কিন্তু, এরা যে-ভাবে ভাষাজননীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে তাতে বরদাসুন্দরীদেবী যে অচিরে বদরুন্নেসা বিবি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই!

চন্দর চৌধুরী মাস্টারের হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—এই! এইবার তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝেছ মাস্টার! হাজার হোক পেটে একটু বিদ্যে আছে ত!

হেড ক্লার্ক নন্দ তরফদার ঘাড় নেড়ে বললে—উঁহুঁ! সে হতেই পারেনা। বাংলার মাটিতে উর্দুর চাষ করলে কি আর ফার্সির ফসল ফলবে দাদা? পাকিস্থান 'পাতিস্থান'ই থেকে যাবে। মাঝখান থেকে আমাদের মাতৃভাষার উর্বর ক্ষেত্র ওদের এই আহাম্মুকীর জন্য কিছুটা আগাছায় ভরে উঠবে, কি বল মাস্টার? বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে কি ওই খিচুড়ি ভাষা কোনোদিন ঢুকতে পারে?

হৃষি দালাল এবার মহা উৎসাহে নন্দবাবুর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলো—আরে, সে জন্যই বা অত ভাবনা কিসের? যদি সেই রকমই দাঁড়ায়—আমরা হিন্দু মহাসভার মারফৎ বা আর্য-সমাজী মতে আমাদের ধর্ষিতা ভাষা-জননীকে আবার শুদ্ধ করে নেবো?

শেষ